KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৪৫ বৈঠকখানা রোড স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher :
Title : অগ্রগতি	Size :
Vol. & Number : ৩/20 ৩/22	Year of Publication : ৩ বৈশাখ, ১৩৪৫ ১৭ বৈশাখ, ১৩৪৫ || April 1938
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : অমল চট্টোপাধ্যায়	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি এ্যাস্ট্রোলজিক্যাল রিসার্চ প্রজেক্ট কার্যালয়ে পাওয়া যাইতেছে।

৮, আশুতোষ শীল লেন, কলিকাতা-৯

	বই-এর নাম	লেখক	মূল্য
১।	রাশি ও লগ্ন বিজ্ঞান রহস্য	পণ্ডিত রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী	৪০·০০
২।	হাতের রেখায় জীবন রহস্য	ডঃ গৌরাঙ্গপ্রসাদ শাস্ত্রী (১ম ও ২য় খণ্ড) প্রতি খণ্ড	৪০·০০
৩।	Expression & Language of the Unconscious	Sri Sabyasachi	৯০·০০
৪।	নতুন দৃষ্টিকোণে গ্রহ নক্ষত্র ও সাব	শ্রীসব্যসাচী	৩৬·০০
৫।	নাড়ী জ্যোতিষ ও ফলিত জ্যোতিষ রহস্য	শ্রীবিষ্ণুদাস জ্যোতিঃশাস্ত্রী	৩৫·০০
৬।	জ্যোতিষী শিক্ষা	শ্রীবিশ্বনাথ দেবশর্মা (১ম,২য়,৩য়,৪র্থ,৫ম খণ্ড) প্রতি খণ্ড ১০·০০, ৩য় খণ্ড	২০·০০
৭।	Jyotish Sanchayan		৪২·০০
৮।	Questions in Jyotisnatak Examination (1975-85) and Hints to Answer	Viswanath Deva Sarma	৩০·০০
৯।	বিজ্ঞানের আলোয় জ্যোতিষ	শ্রীউৎপল চক্রবর্তী	২৫·০০
১০।	Table of Ascendants & Ephemeris	By N. C. Lahiri	
১১।	লঘুজাতকম্	অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য	৩৫·০০
১২।	বৃহৎজাতকম্	ডঃ রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী	৫০·০০
১৩।	জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ	১ম ও ২য়, প্রতি খণ্ড	৪২·০০
	ঐ	৩য় খণ্ড	৬৫·০০
১৪।	গ্রহের দ্বাদশ ভাবস্থিতি ফল	ডাঃ রণতোষ সাহা	৩৫·০০
১৫।	ফলদীপিকা	ডঃ রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী	৬৫·০০
১৬।	ভারতীয় সাহিত্যে জ্যোতিষ প্রসঙ্গ	ডঃ গোপেন্দু মুখোপাধ্যায়	৩৫·০০
১৭।	জ্যোতিষতত্ত্ব সংকেত ও বিশ্লেষণ	শ্রীমলয় রায়	৩২·০০
১৮।	মিথ্যা নয়, সত্য	প্রীতি রায়	২০·০০
১৯।	গ্রহের ভাবপতির দ্বাদশ ভাবস্থিতি ফল	ডাঃ রণতোষ সাহা	৫০·০০

ভি.পি তে পুস্তক পাঠানো হয়ে থাকে। ডাক ব্যয় বাবদ ১০·০০ ও পুস্তকের অর্ধ মূল্য অগ্রিম পাঠাতে হবে।

এ-বছরের একখানি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বই!

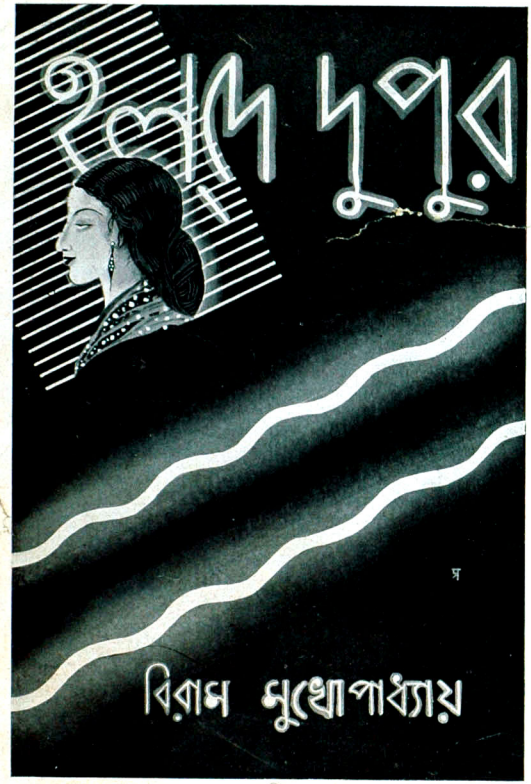

এ-যুগের জটিল জীবন আর নিষ্ঠুর বাস্তবতায় হৃদয়ের ফুল ও যৌবনের ফসল ভস্মীভূত

□
□

বইখানি সম্বন্ধে 'অমৃত-বাজার পত্রিকা'র অভিমত :

"...It holds before us a mirror upon which are clearly reflected the fads and foibles of the modern life with all its catacomb of social and traditional short-comings.

...It is a book crowded with characters, moving, vivid, written with extreme passion and sincerity."

□
□

আজই সংগ্রহ করুন

দাম : এক টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

অগ্রগতি পাব্লিশিং ওয়ার্কস্ ও কোলকাতার প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়

অভিনয়

শিল্পী—শৈল চক্রবর্ত্তী

৩য় বর্ষ, ২০শ সংখ্যা—৩রা বৈশাখ ১৩৪৫

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

যে সব ব্লক্ কাজে লাগে নি

নির্ম্মল ঘোষ

কি করে' একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা পরিচালিত হ'য়ে থাকে সে সম্বন্ধে পাঠকদের কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। তা'রা জানে যে,—লেখকেরা লেখা পাঠায়, শিল্পী ছবি পাঠায়, কম্পোজিটাররা টাইপ্ সাজিয়ে সাজিয়ে লেখা 'কম্পোজ' করে, মেসিনম্যান ফর্মা ছাপে, দপ্তরী বাঁধায় এবং হকাররা নিয়মিত বিক্রী করে' যায়। এটাই হচ্ছে সাধারণ ধারণা। এর চেয়েও যা'রা বেশি জানে, তা'রা আরেকটু বল্‌বে:—প্রুফ্ দেখা, আর, 'মেক্-আপ্' 'লে-আউট্' এবং ব্লক তৈরী পত্রিকা-সম্পাদনার অন্য কয়েকটি অঙ্গও বটে।

কিন্তু এই সাধারণ কয়েকটি বিষয় নিয়ে একটা আফিসকে রীতিমত ভাবে সম্পূর্ণ সপ্তাহটি ব্যস্ত থাকতে হয়। যা'দের নিয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ কাজ, যেমন—কম্পোজিটার, দপ্তরী,……এরা নিশ্চয়ই উঁচু দরের কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে পৃথিবীতে আসে না! সুতরাং এদের ভুল ভ্রান্তি ঘট্‌বেই। কিন্তু সেই ভুলগুলি যে এক এক সময়ে কি রকম মারাত্মক অবধি হয়ে ওঠে তা'র নমুনা বিস্তর পাওয়া যায়। যেমন ধরুন, 'খাজা মহম্মদ আমিন'—এর খাজা ভুলক্রমে 'খোজা' হয়ে গেলো। এতে পাঠকরা যতো ফুর্ত্তিই পাক, আমিন মিঞা কিন্তু তেড়ে আস্‌বে সম্পাদককে। এই ছাপার ভুলের একটা ঐতিহাসিক ঘটনা রয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে যে প্রথম বাইবেল ছাপা হয়েছিলো, তা'র অন্তর্বর্তী Ten commandments-এর অন্যতম অনুজ্ঞা 'Thou shalt commit no adultery" ছাপার দোষে এর থেকে 'no' শব্দটা গেলো উঠে। কল্পনা করুন ক্যাণ্টারবারীর আর্কবিশপ্ এই 'no'-বর্জ্জিত অনুজ্ঞাকে কি ভাবে গ্রহণ করেছিলেন।

ছাপার দিক ছাড়া ব্লকের দিক দিয়েও যে কাগজওয়ালাদের কী বিপত্তি সময় সময় পোয়াতে হয়, তা'র বর্ণনা চলে না।

অজস্র ব্লক আমাদের তৈরী করিয়ে নিতে হয়। অনেক সময়ই আগে থাকতে রচনা ছবি এবং পারৎপক্ষে তা'র ব্লক তৈরী করিয়ে হাতে রাখ্‌তে হয়। এমন হয় অনেক সময়, যে, ছবি নির্বাচিত হোলো, ব্লক্ কর্‌তে পাঠানো হোলো, কিন্তু ব্লক্ হ'য়ে ফিরে এলো এমন সময়ে, যখন রচনা ছাপা হয়ে গিয়ে গোটা কাগজটাই বেরিয়ে গিয়েছে। আবার হয়তো ভুল ছবি পাঠানো হোলো, ব্লক্ হয়ে ফির্‌বার পর ভুল ধরা পড়লো। তখন ব্লকটা কোনো কাজেই আর লাগে না। এই রকমে সম্পাদকের বাঁ পাশের র‍্যাকটায় অজস্র অব্যবহৃত ব্লক্ জমে উঠেছে।

যেমন কিনা, কোনো একটি বিদেশী ডিক্টেটারের প্রণয়িনী

ছবিটা ছাপ্‌লে ডিফামেশন্ হোতে পার্‌তো

হিসেবে একখানা ছবি আমাদের হাতে আসে। ব্লক্ হ'য়ে ছাপ্‌তে যাবে এমন সময় প্রকাশ হোলো যে প্রণয়িনী বলে' যে মেয়েটির

ছবি পাওয়া গিয়েছিলো সে হচ্ছে একটি সাধারণ নর্ত্তকী, থিয়েটারের সঙ্গে তা'র কোনো সম্পর্কই নেই। ছবিটা ছাপলে ডিফামেশন হোতে পারতো।

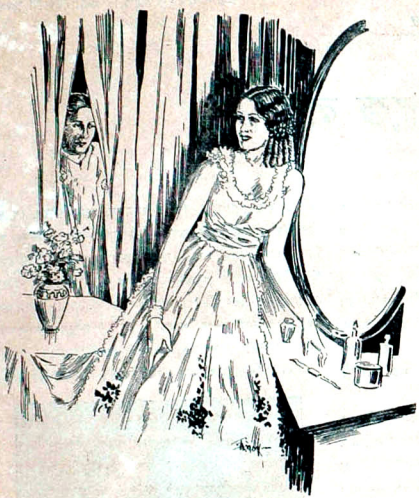

মধ্যরাত্রি এবার মদির হ'য়ে উঠ্‌লো

তারপর আরেকটা ছবি নিয়ে হয়েছিলো কি শুনুন। একটি গল্প এলো, কোনো কল্পিত অভিনেত্রীর অন্তর্জীবন নিয়ে করুণ এক কাহিনী। রোজ সে অভিনয় করে, প্রাত্যহিক অভ্যাস মতই সে অঙ্গসজ্জা করে—রূপকারের স্বপ্নকে রক্ত মাংসের শরীরে ফুলের লাবণ্য নিয়ে ফুটিয়ে দিয়ে। অভিনয়ের শেষে প্রত্যহই তা'র কাছে এসে পৌঁছয় গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের তোড়া—কোনোটায় প্রেরকের নাম থাকে কোনোটায় বা থাকে না। প্রেম তা'র কাছে কোনো রহস্য নিয়ে সন্ধ্যার চাঁদের মতো নদীর জলে ছলছলিয়ে ওঠে না।··· কিন্তু আকস্মিক পুষ্পধন্ব একদিন দেখা দিলো; অভিনেত্রী আবিষ্কার কোরলো স্টলের একটি নির্দ্দিষ্ট আসনে একটি যুবক প্রত্যহই এসে বসে, অভিনয় দেখে, উচ্ছ্বসিত হ'য়ে করতালি দেয়। অসাধারণ কিছু নয়। কিন্তু যে পথে প্রেম আসে যুক্তি সেখানে বাসা বাধে না। তারপর দেখা গেলো রূপসজ্জার রুজে পাউডারে পমেডে ক্রীমে লেগেছে কোন্ একটা অবর্ণনীয় উদ্‌গ্রীবতা! আয়নার দিকে তাকিয়ে আর কিছুতেই পরিতৃপ্তি নিয়ে বলা চলে না: হাঁ এইবারটি ঠিকমতো হয়েছে, এবার স্টেজে যাওয়া যেতে পারে। ওদিকে স্টেজ-ম্যানেজার পর্দার ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে তাড়া দিচ্ছে, সেদিকে খেয়াল নেই। প্রেম—আকস্মিক প্রেম এসেছে আজ জীবনে: অবসর-স্থির মধ্যরাত্রি এবার মদির হয়ে উঠ্‌লো বলে'!

জানি না, ছবিটা কেন সেদিন গল্পের সঙ্গে ছাপা হয় নি। হয়তো বা জায়গা ছিলো না, নয়তো ব্লকটা হাতের কাছে খুঁজে পাওয়া যায়নি প্রয়োজনের সময়। দু' বছর র‍্যাকের ওপর অনাদৃত হয়ে পড়েছিলো।

আরেকটি ছবির পরিচয় আমি কিছুতেই সঠিক বলতে পারি না। কা'র আঁকা জানিনা, কেন ব্লক হয়েছিলো তাও বলা মুস্কিল। হয়তো কোনো অভিনয়ের ব্যঙ্গ ছবি। এমন হতেও পারে যে, ভালো একটা ছবি পাওয়া গিয়েছে, আর্ট-এডিটর ভাব্‌লেন 'ব্লক তো হয়ে যাক্—কাজে লাগ্‌বেই'। তারপর হয়তো তিনি নিজেই ভুলে গিয়েছিলেন নিজের অর্ডারের কথা। সেই থেকে পড়ে' আছে ছবিটা বে-মালিকানা বেপাত্তায়।

আরেক রকমের বিপত্তি আছে: অনেক লেখক আছেন যাঁ'রা

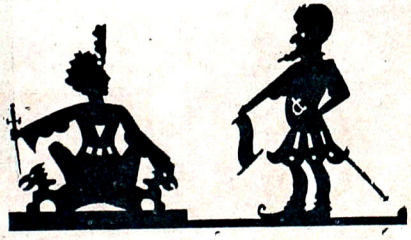

বে-মালিকানা বেপাত্তা ছবি

চান তাঁ'দের লেখা ছবিদ্বারা অলঙ্কৃত হোক্। এখান থেকে সেখান থেকে একে ওকে দিয়ে আঁকিয়ে ছবি জমা দেন ম্যানেজারের কাছে; ব্লক হ'য়ে আসে। রচনা দেখে ব্লক তৈরী না হ'য়ে অনেক সময় ব্লক দেখে রচনা লেখা হয়।—এই দলের লেখকরা নিজেদের আলস্য বা অনবসর বশত সম্পাদকের শেষমুহূর্ত্তের তাগাদা না পেলে কলম ধরেন না। যখন ধরেন, কোন্ ফাঁকে ভুলে যান কোন্ কোন্ ছবি তৈরী হয়ে এসেছে। কলম তখন পত্রিকা-আফিসেরই এক নির্জ্জন কামরার টেব্‌লের ওপর অশ্রান্ত এগিয়ে চলে লেখকের কল্পনার মেজাজ-মাফিক, illustration-এর ঝামেলা থাকে ধামা-চাপা পড়ে'। আমার মনে হয় এই ব্লকটি এই রকম কোনো একটা বিপত্তির অভিজ্ঞান বিশেষ।

কিন্তু সবচেয়ে ফাঁসাদ ঘটে পত্রিকার লেখক-গোষ্ঠী এবং সম্পাদকমণ্ডলী মিলে কোনো একটা ছবি ছাপা হবে কি না, এই নিয়ে যখন তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। যেমন কিনা: স্বাস্থ্যচর্চ্চা বিষয়ক একটি রচনা ছবি-সমন্বিত হওয়া উচিত, সুতরাং কয়েকটি ছবি ব্লক করতে পাঠানো হোলো। রচনাটা কোনো একটা সান্ধ্য মজ্‌লিশে লেখক-গোষ্ঠীর সামনে পড়া হোলো; ছবিগুলি দু' একজন দেখ্‌লেন। সম্পাদক মনে মনে আশ্বস্ত হলেন এই ভেবে যে যাহোক্ রচনাটা সবার অনুমতি পেয়েছে—অতএব খানিকটা দুশ্চিন্তার হাত এড়ানো গেলো। হঠাৎ কোন্ এক কুক্ষণে কোনো নীতিবাগীশ হয়তো বলে' বসলো, 'ছ্যাঃ, করেছ কি হে!

নাকং ব্লক্

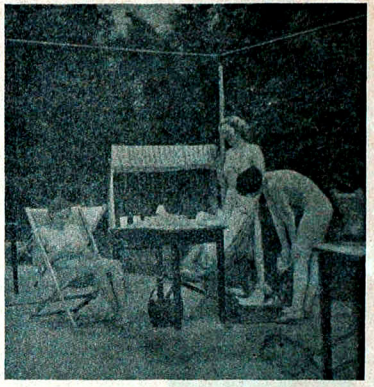

'ছ্যাঃ করেছ কি হে! এই ছবি ছাপ্‌বে?'

এই ছবি ছাপ্‌বে? ডিসেন্সীরও তো একটা সীমা আছে!'··· ঝিমিয়ে-পড়া আসরে লাগে তর্কের জোয়ার। ছবিটা রুচিবিহির্ভূত কি রুচিসঙ্গত, এই নিয়ে আলোচনা ক্রমশঃ ছবি-নির্বাচকের রুচি এবং বিচারের এবং শেষ অবধি মনুষ্যত্বের সমালোচনায় পর্য্যবসিত হয়। ঘরের উত্তাপ ধৈর্য্যের melting point অতিক্রম করবার উপক্রম করে। 'ভালোমানুষ' টাইপের লোকরা শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। কেউ হয়তো অলক্ষ্যে একটা কার্টুন এঁকে ফেলেন। ...তারপর ঘড়ির বড়ো বড়ো কাঁটাগুলো বেজে গিয়ে যখন ছোটো ছোটো কাঁটাগুলো টাং টাং করে' বাজবার ইঙ্গিত করে, মজ্‌লিশ্ ভাঙ্গে, কিন্তু মেজাজ মচ্‌কায় না। অর্থাৎ ছবিটা আর জাত পেলো না। 'এই ছবি? ছিঃ, লোকে বল্‌বে কি!'— সেই থেকে বেচারা ব্লক্, স্বাস্থ্যচর্চ্চার নিদর্শন হিসেবেই তালা আট্‌কানো আলমারীর মধ্যে 'এক্‌জিবিট্ নাম্বার···' হ'য়ে পড়ে-ছিলো, অহল্যার পাষাণত্ব-প্রাপ্তির মতো।

আরেকবার হয়েছে কি, একটা কবিতা illustrate কোরবার জন্যে গোটা কয়েক ছবি লেখকের মতাহুযায়ী ব্লক্ হ'য়ে এলো। কিন্তু শেষে সাব্যস্ত হোলো যে ছবিগুলোর মধ্যে গোটা দুই এমন স্থূল যৌন ইঙ্গিত হয়তো দিচ্ছে যাতে কবিতার সূক্ষ্ম রসটি বাহত হয়ে পড়ে। সুতরাং ব্লক্ দুটো ছাপা হোলো না, পড়ে' রইলো।

লেখক এবং সম্পাদক অনেক সময়ে যে সব বেহিসাবী কাজ করে' বসেন, আগেকার লেখা থেকেই আপনারা সে রকমের আভাষ পেয়ে থাকবেন। কিন্তু আর্টিস্টের কাণ্ডজ্ঞানও যে মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গে রসিকতা করে' থাকে তা'র একটা উদাহরণ ডান পাশের ব্লকটায় পাওয়া যাবে। বলা হোলো আম্র পল্লব দিয়ে সাজিয়ে একটি মঙ্গল ঘট এঁকে দিন। আর্টিস্ট পরের দিন নিয়ে এলেন এঁকে ঘটটি। দেখা গেলো মঙ্গল ঘট জানার আকার পেয়েছে, আর আমের পাতায় ছাপ পড়েছে পেয়ারা পাতার। আর্টিস্ট্ সমবেত বন্ধুদের কাছে অপদস্থ হ'য়ে মনে মনে নিজের কাণ্ডজ্ঞানের কান দিলেন আচ্ছা করে' মলে'। কিন্তু ঘটের ব্লক্ পেলো যাবজ্জীবন নির্বাসন।

কিন্তু 'ব্লক্-মেকারস্' যাঁ'রা তাঁ'রাও যে অঘটন ঘটাতে পারেন, সে কথা সত্যি হলেও বিশ্বাসের বাইরে। একটি মেয়ের ছবি, সুন্দর চেহারাটি, কাঁগে ঘড়া। হয়তো,.....হয়তো কেন, নিশ্চয়ই অন্য কোনো পত্রিকার অর্ডার ছিলো এটা। পোস্ট্ অফিসের পেয়াদারা মাঝে মাঝে ভুল ঠিকানায় চিঠি বিলি করে; বা পাশের ব্লকখানা সম্ভবত এই রকমই ভুল-বিলির দৌলতে আমাদের হাতে এসে পৌছয়। ভালো ছবি, ভালো ব্লক্, মেরে দিলুম। কিন্তু 'মেরে দিলে' হবে কি, কাজে লাগাতে হবে তো! সুযোগ মিল্‌লো না, প্রত্যেক সপ্তাহেই একবার করে' ব্লকটা ড্রয়ার থেকে বেরোয়, আবার যথাসময়ে ড্রয়ারের ডালার যবনিকা পড়ে ব্লকটার ওপর। এম্‌নি করে' বছরের অর্দ্ধেকটা যখন গেলো কেটে, এই প্রবন্ধ লিখ্‌বার সুযোগ এলো। রচনাটা প্রায় শেষ করে' এনেছি এমন সময় সুবিধাবাদী সম্পাদক জানালেন ব্লকটাকে কোনোরকমে লেখাটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে। কা'র ছবি, কিসের ছবি,—কিচ্ছু জানা নেই, কিন্তু কাজে লাগ্‌লো এবার।

মঙ্গল-ঘট না মঙ্গল-জালা?

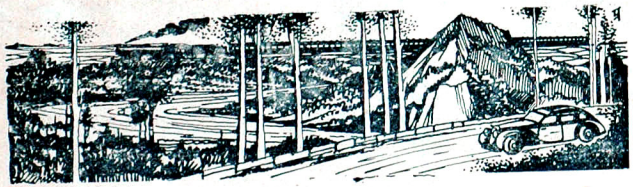

হয়ত

আশু চট্টোপাধ্যায়

আজকের সকালে যে সানাই তার পিছনে থাকতে পারত বিহিটা রেল দুর্ঘটনা, পদ্মার বুকে ষ্টিমারে ঝড় কিংবা শিলং-এ সতী ফল্‌স্-এ কয়েকটি অপরূপ সন্ধ্যা। আবার এই পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলির মধ্যে থাকতে পারত একটা অদৃশ্য যোগসূত্র—যা হয়ত আজকের সকালের ফুলগুলোর মধ্যে দিয়েও চলে' যেতে পারত।

ধরুন, রাণীর সঙ্গে আমার আলাপ হ'তে পারত পাঞ্জাব মেলের সেই দুর্যোগ-সম্ভাবিত বেগের মধ্যে। ট্রেণের ঝাঁকুনিতে সন্ধ্যা-রাত্রিতেই তার বাপ-মার ঘুমিয়ে পড়বার বদ্-অভ্যাস থাকতে পারত। বাইরের অন্ধকারের চেয়েও কামরার ভিতরের একটি বেন্‌চ্ রাণীর কাছে বেশী চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠা এমন কিছু আশ্চর্য্যের হ'তনা। যেমন সাধারণত ঘটে' থাকে। খুচরো কথাবার্ত্তার কখন যে কেমন ক'রে শুরু হ'ত, হঠাৎ এসে পড়ত সেই নিদারুণ ঘটনা, বাপমায়ের ঘুম আর না-ও ভাঙতে পারত এবং আহত রাণীর তত্ত্বাবধানে প্রচুর আনন্দও আমি হয়ত পেতে পারতাম। এলাহাবাদে তার জ্যেঠামশাই-এর কাছে তাকে পরে ফিরিয়ে দিয়ে এলেও সেই রাত্রির বিপর্য্যয়ের পটভূমিকায় দুটি মনে যে শিখা জন্মগ্রহণ করত আজকের মঙ্গলদীপের জ্যোতি বাড়াতে তার হয়ত কার্পণ্য দেখা যেতনা।

কিংবা ধরুন, আমার জীবনে রাণীর হয়ত আবির্ভাব হ'তে পারত শিলং পাহাড়ের রৌদ্রালোকিত পাইন গাছের পটভূমিকায়। না, অমিত রায়ের সেই প্রসিদ্ধ লাবান রোডে নয়, আমি কোনো এক ঈষদুষ্ণ মধ্যাহ্নে ধরতে পারতাম সরকারী জেলরোড। সবুজ গল্‌ফ্ লিঙ্কের পাশ দিয়ে যখন চলেছি তখন আমার মনে ঘাস, ফার্ণ আর পাইনের সমারোহ, তরঙ্গায়িত দিগন্তের অস্ফুট হাতছানি। সতী ফল্‌সের কাছাকাছি গিয়ে দূর থেকে রাণী রাইকে দেখতে পাওয়া এমন-কিছু আশ্চর্য্যজনক ঘটনা হ'তনা। ততক্ষণে হয়ত বিকেল হয়ে আসত এবং তারও পরে উচ্ছল পর্ব্বত-দুহিতার গা থেকে হয়ত পিছলে পড়ত গোধূলির রূপালী আলোর স্রোত, আমাদের প্রথম পরিচয়ের আলাপের মধ্যেও হয়ত আসত ঔৎসুক্যের বাণ। তারপর দুটি বদ্ধ্যা সন্ধ্যার পর কোকেট দুপুর হয়ত উচ্ছলতর হয়ে উঠত লেকের ধারে এ্যাপ্‌ল গার্ডেন্-এ, সেভন্ ফল্‌স্-এ কিংবা বিডন আর বিশপ্ ফল্‌স্-এ। এর পর লাবান-এ রাণীদের বাড়ীতে আমার নিমন্ত্রণ হওয়া এমন-কিছু বিচিত্র হ'তনা এবং তার আত্মীয়দের দ্বারা আমার আপ্যায়িত হওয়াটাও পৃথিবীর ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা' হয়ে থাকত। এরকম প্রায়ই ঘটে' থাকে।

সতী ফল্‌স্-এর কোনো-একটি স্পন্দিত সন্ধ্যায় রাণী হয়ত আমার বুকের খুব কাছে সরে' এসে বলত, "শিলং পাহাড়ের সন্ধ্যেগুলি খুব চমৎকার। নয়? কিন্তু কলকাতায় এদের গায়ে হয়ত ধুলো লাগবে।"

পরিস্থিতিটাকে একটু হাল্কা করে' দেবার চেষ্টায় আমি হয়ত একটু তরল সুরেই উত্তর দিতাম, "সতী ফল্‌সের ইতিহাস জান ত? দুজন দুজনকে না পেয়ে একদিন এর মধ্যেই আশ্রয় খুঁজেছিল। সেদিক দিয়ে আমাদের কলকাতার ঢাকুরিয়া লেকও কম যায় না।"

তারপর তার বিধুর দুটি চোখে সন্ধ্যার ছায়া দেখতে পেয়ে তার হাতের চুড়িগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে হয়ত বলতাম, "আর ধুলো যদি লাগেই তা ঝেড়ে ফেলতেও কি সময় লাগে!"

না, আমার কলিকাতাগামী ট্রেণের চাকায় হয়ত বিরহের সুর করুণ ভাবে বাজত না। হয়ত আজকের এই সানাইএর আভাস তাতে পেতাম।

কিংবা ধরুন, কোনো-একটি চৈত্রের রাত্রি। ঢাকা থেকে ষ্টিমার চলেছে গোয়ালন্দের দিকে। কঠিন মাটিতে পা দিতে আর খুব জোর ঘণ্টা দুয়েক বাকী। সেকেণ্ড ক্লাস কেবিনের ডেকে রেলিঙ্-এ ভর দিয়ে আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম। পদ্মার বুকে তখন গাঢ় অন্ধকারে ঢেউ ভাঙ্‌ছে।

হঠাৎ কোথা থেকে কেমন করে' লাল মেঘে আকাশ ভরে যেত। কল্পনা করুন একবার, পদ্মার বুকে ঝড়! সেই পরম মুহূর্ত্তে মহাপ্রলয়ের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হ'ত। মনে হ'ত পৃথিবীর সঙ্গে এই ক্ষুদ্র ষ্টিমারখানির আর কোনো সম্পর্ক নেই। এখনি তাকে হয়ত মহাশূন্যে আছড়ে ফেলে দেওয়া হবে। চারদিকে আর্ত্ত চিৎকার, ছোটাছুটি, শিকল ফেলার শব্দ। হঠাৎ আমার পাশের কেবিন থেকে রাণী বেরিয়ে এসে আমার

কাঁধটা ধরে' বিহ্বল কণ্ঠে বলে' উঠল, "কি হবে, বলুন, কি হবে ?"

আমি হয়ত অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকতাম। হয়ত সেই মুহূর্ত্তেও চিনতে পারতাম এই সেই মেয়েটি যে ঢাকার ডাক্-বাঙলোর সামনে দিয়ে রোজ সকালে গাড়ী করে' যেতে যেতে বারান্দায় আমার দিকে চেয়ে হাতছানি দিয়ে যেত।

রমনার পলাতককে বাছুর এত সন্নিকটে পেয়ে আমার রক্তেও যদি ঝড় উঠত তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু থাকত না। আশ্বাস দেবার ভঙ্গীতে তার পিঠটা ধরে' রেলিং-এর আরও কাছে টেনে নিয়ে বলতাম, "পদ্মার দেশের লোক আপনি, ঝড় দেখে ভয় পেলে চলে ? ভাবছেন কেন, এখনি থেমে যাবে।"

তার গুঁড়িয়ে-যাওয়া খোঁপার সমুদ্রেও ঝড় উঠত, তার তরঙ্গগুলো আছড়ে পড়ত আমার সর্ব্বাঙ্গে। তার সমস্ত দেহেতে কাঁপত উপবাসী বুকুক্ষু দুরন্ত হাওয়া। পাখীর মত দুটি চোখ কুলায় খুঁজত সেই উদ্বেলিত আবাহওয়ায়। অন্ধকারের বুক চিরে বাজত ষ্টিমারের ভয়ার্ত্ত বাঁশী। এরপর কেউই কোনো কথা বলতাম না, দুজনের দেহের মাঝখানে জেগে থাকত একটি লেলিহান শিখা। সেইটিই হয়ত জ্বলত আজকের ওই হোমাগ্নির মাঝখানে।

কিংবা হয়ত, ধরুন, একটি ছোট ষ্টেশনে নেমে গ্রীষ্মাবকাশ কাটাতে যেতে পারতাম বাঙলার কোনো এক পল্লীগ্রামে। রাত্রি গভীর। তার ওপর সেদিকটার একটু দুর্গম থাকত, তাই আমার দোসলা বন্দুকটা থাকত সঙ্গে। গরুর-গাড়ীর চাকার একটানা শব্দে আমার চোখ ঘুমে ঢুলে আসত। কলকাতার রুক্ষ, কর্কশ, যান্ত্রিক কোলাহলের পর ভারী ভাল লাগত গ্রামের এই নিস্তব্ধ মেঠো রাস্তা। কয়েকটি নির্জ্জন, সুমিষ্ট দুপুরের স্বপ্ন দেখত মন।

হঠাৎ ত্রস্তে উঠে বসতাম। একটা ভীষণ হট্টগোল অর্দ্ধেক রাত্রির শান্তিকে টুকরো করে' দিত। আর উঠত কয়েকটা আর্ত্ত চিৎকার। ব্যাপারটা অনুমান করে' নিতে বিলম্ব হ'তনা। অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে করতাম কয়েকটা ফাঁকা আওয়াজ। তারপরই সমস্ত কোলাহল থেমে যেত। নেমে একটু এগিয়ে গিয়েই দেখতে পেতাম, গাছতলায় নামান রয়েছে দুটো পাল্কি। বেশীর ভাগ বেয়ারাই সাংঘাতিকভাবে আহত হয়ে পড়ে'—বাকী ক'জন পলাতক। একটি পাল্কির পাশে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক পড়ে থাকতেন। দেখে মনে হ'ত না যে তাঁর দেহে প্রাণ আছে। অপর পাল্কি থেকে আসত কান্নার শব্দ।

কাছে গিয়ে বলতাম, "আপনি বাইরে আসতে পারেন। আর ভয় নেই। তারা চলে' গেছে।"

পাল্কির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসত রাণী। দেহের ও শাড়ীর সমস্ত রেখাগুলি শাসনের বাইরে চলে' যেত। দুটি ডাগর চোখের সঙ্গে কোথায় যেন রাত্রিটির মিল থাকত।

তারপর সে গিয়ে বসত তার বাবার মাথাটা কোলে নিয়ে। তাকে যে আর ফিরে পাওয়া যাবে না একথা তাকে বলতে আমার বাধত! মাথার ওপর দিয়ে রাত্রি ছুটে চলত সূর্য্যের দিকে। যে-অশ্রুর ধারা রাণীর চোখ দিয়ে সে রাত্রে নামত না, তাই জমা থাকত আজকের ওই মঙ্গলঘটের মধ্যে।

ধরুন, কলকাতার একটি ড্রয়িংরুম। রোজের অভ্যাসমত আমি ব্যাক্‌ত্রাস্ করা চুল নিয়ে চোস্ত চেহারায় সেখানে একটি বিশেষ সন্ধ্যায় হাজিরা দিতাম। সেদিন থাকত একটি ছোটখাট উৎসব। ভেবে যেতাম সেই একঘেয়ে পুরনো মুখগুলিই দেখতে পাব, শুনতে হবে সেই একঘেয়ে পুরনো কথাবার্ত্তা, সেই হাল্কা রসিকতা, সেইসব হাস্যকামী-পূর্ণ গান!

কিছুক্ষণ ধরে' চলতও তাই। হঠাৎ ঘরে আবির্ভাব হ'ত একটি অসামান্যা মেয়ের। গৃহস্বামী সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন, "এটি আমার বন্ধু সঞ্জীব রায়ের মেয়ে। দাও ত মা রাণী, এঁদের একটা গান শুনিয়ে তোমার সত্যি পরিচয়টা দিয়ে।"

গান আমার অনেক শোনা থাকলেও অমনটি কখনও শুনেছি কিনা মনে পড়ত না। রাণীর সর্ব্বাবয়বে ঘিরে থাকত একটা স্বচ্ছ স্বাতন্ত্র্য। যে ক'জন সেদিন তার সঙ্গে কথা বলতে যেত তারা তার প্রখরতার কাছে হার মেনে চুপ করে' যেত। আমি একটি কোণে চুপ করে' বসে' বসে' সমস্ত ব্যাপারটি উপভোগ করতাম। সেদিনকার দুর্য্যোগময় পরিবেশে আড্ডেঞ্চার করতে যেতাম না। সন্ধ্যাটি সার্থক হয়ে উঠত রাণীর একটি—না, ভারতীয় নয়—স্পেনদেশীয় উদ্দাম নাচে।

সকলেই তৃপ্ত মনে বাড়ী ফিরে যেত, কিন্তু আমার মনে আশ্রয় নিত একটি নিদ্রাহীন অতৃপ্তি। এই প্রখরবুদ্ধিশালিনী, ব্যক্তিত্বময়ী বিলাত ফেরত মেয়ের নাগাল পাওয়া সোজা কথা হ'ত না। কিন্তু ব্যাপারটা যেখানে সোজা নয় সেখানেই থাকত আনন্দ। সোজা না হ'লেও ব্যাপারটা আমার পক্ষে শেষপর্য্যন্ত অসম্ভব হয়ে উঠত না। মশোর রোডে আমার বেগবান কারে পাশের সিটে কোনো-এক-সন্ধ্যায় বসে' থাকত রাণী। তার দিকে মুখ না ফিরিয়েই আমি প্রশ্ন করতাম, "ইউরোপের রাস্তাগুলো এখানকার রাস্তার চেয়ে নিশ্চয়ই খুব বেশী চমৎকার। কি বলেন ?"

রাণী আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে উত্তর দিত, "বেশী মসৃণ। কিন্তু চার-পাশের দৃশ্য এত ভাল নয়।"

"বলেন কি!" আমার বিস্ময় রাগ মানত না, "আপনি ইউরোপে মানুষ হয়েছেন কিনা, তাই বাঙলা দেশ নতুন বলে' এত ভাল লাগছে।"

"হয়ত তাই।" প্রথর মেয়ে রাণীর চোখেও মেঘ ক'রে এসেছিল, "কিন্তু দুপাশের ওই ঘন গাছগুলো আর গ্রামগুলোর ভারী মিষ্টি লাগছে।"

হয়ত একটু রসিকতা করবার চেষ্টা করতাম, "এখানের বাতাসে জলের ভাগ বেশী কিনা, তাই সবকিছুই স্নিগ্ধ মনে হয়। এখানকার লোকেরা ঘর বেঁধে শান্তশিষ্ট হয়ে বাস করতে ভালবাসে।"

সামনের দিকে তাকিয়ে রাণী শান্ত গলায় বলত, "শান্তভাবে ঘর বাঁধা কি খারাপ!"

আমার হাতের ষ্টিয়ারিংটা যেত একটু কেঁপে, কিন্তু গাড়ীতে আসত আরও বেগ। এই অপ্রত্যাশিত উত্তরে আমার রক্ত চুপ করে' থাকত কেমন করে'!

সেই ঘর-বাঁধারই আয়োজন থাকত আজকের এই উৎসবের গৃহ-সজ্জায়।

কিংবা, ধরুন, আসানসোল ষ্টেশনে কলকাতাগামী ট্রেনের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম কোনো একদিন। যথা সময়ে ট্রেণ আসত, প্লাট্‌ফর্ম্মে পড়ে' যেত সোরগোল। নামত যত লোক উঠত তারচেয়ে বেশী। হয়ত আমি উঠতে একটু বিলম্ব করতাম, ভাবতাম ভীড়টা কমুক, তারপরে ওঠা যাবে। হঠাৎ দেখতে পেতাম এক মোটা ভদ্রলোক অনেক মোট, একটি মোটা গৃহিণী এবং অনেকগুলি ছেলেমেয়ে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির। ইন্টার ক্লাসে প্রচুর ভীড়। ভদ্রলোক জিনিষপত্র আর ছোটছোট ছেলেমেয়েদের তুল্‌তে ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। ক্ষিপ্র হবার মত তাঁর শরীরের অবস্থা নয়—তাঁর ব্যস্ততা শুধু বাধারই সৃষ্টি করত। শেষ পর্য্যন্ত গৃহিণীর মাংসস্তূপকে তোলবার পরই গার্ডের হুইসল্ বাজত। আমি অবাক হয়ে দেখতাম ভদ্রলোকের নিজের দেহটিকে দরজার মধ্যে দিয়ে ঢোকাবার কসরৎ এবং সঙ্গে সঙ্গে মুটেদের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধ। তারপরই আসত গাড়ীতে বেগ। গাড়ীতে ওঠা হত না আমার এবং তাঁর বড় মেয়েটির। যৌবন ধর্ম্ম-সুলভ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সে এতক্ষণ সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকত। গাড়ী চলতে সুরু করলেই বাপের গেরাল হত', মেয়ে গাড়ীতে ওঠেনি। তাঁর ত্রস্ত চিৎকার ট্রেনের গর্জ্জনে চাপা পড়ে' যেত।

আমি মেয়েটির কাছে গিয়ে বলতাম, "ভয় পাবার কিছু নেই। আমি এখনি বর্দ্ধমানে টেলি করে' দিচ্ছি। আপনার বাবা সেখানে অপেক্ষা করবেন এখন। পরের ট্রেণে আমি আপনাকে সেখানে পৌঁছে দেব। কি নাম আপনার ?"

দেখতাম মেয়েটির চোখে ভয় বা কুণ্ঠার চিহ্নমাত্রও থাকত না। স্পষ্ট গলায় উত্তর দিত, "রাণী।" তারপর আমার চোখের দিকে চেয়ে বলত, "মান, টেলিটা করে' দিয়ে আসুন। কিন্তু টিকিটের কি হবে ? বাবার কাছে যে টিকিট। আর আমার কাছেও টাকা নেই।"

বলতাম, "তার জন্যে ভাবনা কিসের! আমি করে' নিচ্ছি। দামটা বর্দ্ধমানে আপনার বাবার কাছে চেয়ে নেব। আপাতত চলুন ওয়েটিং রুমে একটু বসবেন। পরের গাড়ীর এখনও দেড় ঘণ্টা দেরী।"

ঘণ্টাখানেক পরে সে যখন আমার সঙ্গে খেতে বসত তখন তার এই নির্ভীক কুণ্ঠাহীন প্রফুল্লতার রঙ লাগত বিকেলের আকাশে। একটু মৃদু হেসে বলত, "দেখুন ত, আমার জন্যে আপনাকে কত কষ্ট পোহাতে হ'ল! আর, আমি জানি আমার জন্যেই আপনার আগের ট্রেণে যাওয়া হয় নি।"

আমি একগাল খাবার সামলাতে সামলাতে জবাব দিতাম, "কিন্তু তা না হলে' রাণীর সঙ্গে আলাপের রাণী-বাঁধা ত হত না!"

তার বাবার সুকৌশল চেষ্টার মধ্যে দিয়ে সেই রাণীবন্ধন রূপান্তরিত হ'ত আজকের এই গাঁটছড়ায়।

কিংবা হয়ত, ধরুন,—

থাক্। আসল কথা বলি। গল্প ক'রে বলবার কিছু নেই। রাণী আসছে আমার ঘরে নেহাৎ মামুলী ধরণে। পাত্রী দেখার যথাযত ব্যবস্থা হয়েছিল। চিরাচরিত আয়োজনে কোনও ফাঁক পড়েনি। যা হতে পারত আর যা হয়েছে তার মধ্যে পাছে ফাঁক থাকে এই আমার ভয়।

সাহিত্য-সমালোচনা

বঙ্কিমচন্দ্রের শতবার্ষিকী স্মৃতি-উৎসব উপলক্ষ্য করে' দেশের নানা জায়গায় সভা ইত্যাদি হচ্ছে। কেরী সাহেবের বাংলাভাষা রামমোহন রায়ের যুগ অতিক্রম করে' যখন পরবর্তী যুগে প্রবেশ কোর্‌লো, বঙ্কিমচন্দ্র সে সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী লেখক। বাংলাভাষার তৎকালীন পরিপূর্ণ স্ফূরণ বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যভাষার মধ্যেই পাওয়া যাবে।

কিন্তু বঙ্কিমের এই তৎকালীন শ্রেষ্ঠত্ব তাঁ'র একশো বছর পর অবধি টেনে নিয়ে এনে সেই পুরোনো মর্য্যাদা বর্তমানকালের লেখকদের রচনার মাপকাঠিতে বসিয়ে যদি কোনো সমালোচক বলেন যে, অদ্যাবধি বঙ্কিম বাংলাদেশে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, তা' হ'লে একদিকে হয় স্বীকার কর্‌তে হবে যে বাংলাভাষা প্রগতিশীল সাহিত্য সৃষ্টি করেনি, (যেটা স্বীকার কর্‌লে বাংলাভাষার জীবনীশক্তিতে অবিশ্বাস কর্‌তে হয়), অথবা বাধ্য হ'য়েই স্বীকার কর্‌তে হয় যে উক্ত সমালোচক একটি অকাট মূর্খ ; বঙ্কিম সম্বন্ধে তাঁ'র শ্রদ্ধা পৌত্তলিক শ্রদ্ধারই মতো।

বাংলাভাষার যদি জীবনীশক্তি না থাক্‌তো তা' হ'লে বঙ্কিমের মৃত্যুর পর বাঙালী বাংলাভাষায় লিখ্‌তো না ; মধ্য ঊনবিংশ শতকের ফেরঙ্গ মনোবৃত্তিসম্পন্ন শিক্ষিত বাঙালীর অনুসরণে জাতশুদ্ধ বাঙালী ইংরেজী ভাষার অনুশীলন কর্‌তো। কিন্তু তা' যে করেনি, অর্থাৎ বাংলাভাষা যে একটি প্রগতিশীল ভাষা, তার প্রমাণ বাঙালী পাঠককে নতুন করে' দিতে হবে না।

বঙ্কিমের স্টাইল্ অদ্যাবধি বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ স্টাইল্ কিনা এ নিয়ে আলোচনা চলে না। বঙ্কিমের সাহিত্য-রীতি অন্যযুগের সাহিত্য-রীতির থেকে পৃথক।

অথচ একাধিক নামজাদা সাহিত্য-সমালোচক এই ভুলটাই করেন : মানসিক দুর্বলতা বশত এবং বঙ্কিম সম্বন্ধে অত্যধিক ভক্তিবশত তাঁ'রা বঙ্কিমের রচনাকে আধুনিকতম সাহিত্যিকের রচনার সঙ্গে তুলনা করে' পরোক্ষে বাঙালী জাতির সাহিত্য প্রচেষ্টাকেই অবজ্ঞা করেন।

এক যুগের সামাজিক ও অন্যান্য আদর্শ অপর যুগের তৎ তৎ আদর্শ থেকে অনেকটাই আলাদা। যুগ-মন এবং যুগ-মননকে আশ্রয় করে' যুগ-সাহিত্য গড়ে' ওঠে, এবং যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের রচনায় সেই যুগ-মন এবং যুগ-মননের ছাপ পড়ে। এক যুগের আদর্শ যখন যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হ'য়ে থাকে, তখন এক যুগের সাহিত্য-আদর্শও পরবর্তী যুগের সাহিত্য-আদর্শ থেকে বিভিন্ন হ'তে বাধ্য। সেই জন্যেই কাদম্বরীর প্রথম অনুবাদকের বাংলা রচনা-রীতি বঙ্কিমের অনুগামী হ'লেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তা'র প্রত্যক্ষ সাদৃশ্য কোথায়? 'কপাল-কুণ্ডলা'র রচনা-রীতি 'শেষের কবিতা'র স্টাইলের থেকে ভালো না মন্দ,—এ নিয়ে আলোচনা চলে না।

যুগ-মন এবং যুগ-মননকে আশ্রয় ক'রেই যখন যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত হ'য়ে থাকে, তখন একথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে যে 'Art is the propaganda of the Age.'

বঙ্কিমকে তাঁ'র যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এই জন্যেই বলি যে, তাঁ'র যুগের বাংলাদেশের যুগ-মনন তাঁ'র রচনায় ছায়া ফেলেছিলো। এবং সেই জন্যেই বঙ্কিমচন্দ্রকে ১৯৩৮ সালের মাপকাঠিতে আন্‌তে পারি না, কেননা আজকের বাংলাদেশের যুগ-মনন বঙ্কিমের সমসাময়িক না।

একথা সহজেই বলা যায় যে, বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎ-চন্দ্রের সাহিত্যে যে পারিপার্শ্বিকতার সংস্থান দেখ্‌তে পাই, তা' হচ্ছে : সমাজের উচু স্তর - মানে যাকে বলা হয় leisure class —তা'র থেকে ক্রমেই সরে' সরে' নিচুতে নাম্‌ছে। আধুনিকতম সাহিত্যে middle class—মানে বুদ্ধিজীবি মধ্যবিত্ত সমাজ বিশেষ করে' প্রভাব বিস্তার করেছে।

বর্তমান সাহিত্যকে, সেইজন্যে, বিচার কর্‌তে গেলে, আগে সমালোচককে পরিষ্কার জান্‌তে হবে এবং জানাতে হবে যে, বর্তমান কালের সাহিত্যিকরা সমাজের কোন্ স্তর থেকে আস্‌ছেন। এবং আধুনিক সাহিত্যিকরা সেই স্তরের মননকে যথাযথ উপলব্ধি কর্‌তে পেরেছেন কিনা।

সাহিত্য-সমালোচনার মূলে যে ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক ভিত্তি থাকে, সে সম্বন্ধে কোনো নির্দিষ্ট জ্ঞান যদি নাই রইলো, তবে সে আলোচনা তো সত্যিকার সমালোচনার মাপকাঠিতে পড়্‌তে পারে না!

—নি

কেশোৎপাটন

চুলের গোড়া খুব নরম। জোর করে' শরীর থেকে লোম ছিঁড়লে অনেক সময়ই 'লোম ফোঁড়া' নামে একটা জ্বালাকারী অসুখ হয়। কিন্তু মান্দ্রাজে সথ্থ্মালাই আপ্পারাও নামের একটি লোক নিজের মাথা থেকে মুঠো মুঠো চুল টেনে ছিঁড়তে পারে;

এতে তা'র কোনও কষ্ট হয় না। লোকটি এই লোম-ছেঁড়ার প্রদর্শনী দেখিয়ে তা'র জীবিকা অর্জ্জনের এক উপায় বে'র করেছে।

খাড়া করে' মড়া-পোড়ানো

কোনো একজন কংগ্রেস নেতা জীবিতকালে অত্যন্ত তেজী লোক ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সারাজীবন কারো সাম্‌নে তিনি মাথা নিচু করেন নি ; অতএব মৃত্যুর পরেও তাঁ'কে যেন মাথা উঁচু করে' দাহ করা হয়। তাঁ'র এই ইচ্ছা পূরণের জন্যে তাঁ'র গুণগ্রাহীরা মৃত্যুর পর দাঁড়ানো-অবস্থায় রেখে তাঁ'র শব-সংকার করেছিলেন।

আইনের বেয়াড়া ব্যাপার

স্থলপথের থেকে জলপথের আইন পৃথক্। একবার হয়েছে কি, লণ্ডনের এক রাস্তা বৃষ্টিতে জলে 'জলারণ্য' হয়ে গেলো। এক ভদ্রলোক সাধারণ আইন অনুযায়ী রাস্তার বাঁ' পাশ দিয়ে মোটর গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছিল। ওদিকে, একটি লোক একটা নৌকা চালিয়ে 'আপন ডাইন' অনুসারে চল্‌ছিলো। মোটর গাড়ী আর নৌকো হোলো মুখোমুখি, লাগ্‌লো ধাক্কা, দু'টো যানই হোলো damaged. দায়ের হোলো মামলা ; কিন্তু সমস্যা হোলো—কোন্ ধরণের আদালতে মাম্‌লা চল্‌বে : জল-সংক্রান্ত আইনের না সাধারণ ট্রাফিকের আদালতে! এই সমস্যা মীমাংসা কোরবার জন্যে হাইকোর্ট্, প্রিভি কাউন্সিল, হাউস অব্ লর্ড্‌স্, মন্ত্রী-সভা, সম্রাট স্বয়ং……এইভাবে যখন আইনের কূটতর্ক নানাবিধ স্টেজ্ পার হয়ে শেষঅবধি পৌছল, তখন দেখা গেলো নৌকো এবং মোটর-গাড়ী—এদের দুটোরই মালিক গিয়েছে মরে', দু' দুটো যুদ্ধ ঘটেছে, চারটে রাজা পরিবর্ত্তন হয়েছে, এগারোটা মন্ত্রীসভা অদল বদল হয়েছে এবং মূল মাম্‌লার কাগজপত্রকে রাজকীয় গোপন দলিল ভ্রমে বিদেশী কোনো রাষ্ট্রের গোয়েন্দারা চরী করেছে।

নির্জ্জলা কৌলিন্য

প্রবাদ আছে : নাবিকদের নাকি প্রত্যেক বন্দরে স্ত্রী থাকে। এটা গল্প, কিন্তু পালোচ্চি নিওনিনি নামে একটা লোক প্রতিজ্ঞা করেছিলো এই বলে' যে সে পৃথিবীর সব দেশেই একটি করে' বিয়ে কর্‌বে। এবং এই প্রতিজ্ঞা-রক্ষা-কল্পে ভদ্রলোক একের পর এক করে' প্রথমে ইয়োরোপে তারপর অ্যামেরিকায় বাহান্নটি

বিয়ে সমাধান করে' আফ্রিকায় প্রবেশ করেছে। সেখানে বিভিন্ন দেশে সতেরোটি বিয়ে শেষ ক'রে বর্ত্তমানে ভদ্রলোক আশ-পাশের দ্বীপগুলিতে ঘুর্‌ছেন। তিনি আশা করেন যে আর মাস কয়েকের মধ্যে এশিয়ায় আসবেন, এবং আরব দেশ থেকে সুরু কোরবেন। ভারতবর্ষ তাঁর প্রোগ্রামে শেষ স্থান পেয়েছে।

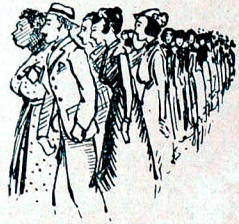

তরুণ সাহিত্য ও সমাজ

চাণক্য দেবশর্ম্মা

শিশু-সাহিত্য, গণ-সাহিত্য বা নৈতিক-সাহিত্য বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয় নয়। সাহিত্য বল্‌তে আমি কাব্যকেই বুঝি। অন্ততঃ অভিধান তাই নির্দ্দেশ করে। কবি-কল্পনার আশ্রয়ে যে সাহিত্য গড়ে' ওঠে তারই নাম কাব্য, কথা-সাহিত্য বা রস-সাহিত্য।

এই বিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথের স্পর্শে শরৎচন্দ্রের ভাবে বীরবলের ছন্দে এবং ভাষার স্বাতন্ত্র্যে যে সাহিত্য গড়ে' উঠ্‌ছে তাকে তরুণ সাহিত্য বলা যায়। এই তরুণ সাহিত্য উনবিংশ শতাব্দীরও পূর্ব্বতন সাহিত্যের একটি অভিনব ধারা। সাহিত্যের এই যুগধারা আপন শক্তিতে প্রবল বাধা ভেঙ্গে সমাজের ভিতরে পথ করে' নিয়েছে। যাঁরা তরুণ বা তরুণের তারুণ্যকে সহ্য করে' চল্‌তে পারেন, তাঁ'রাই এর ভক্ত। নিজের ধর্ম্ম সমাজ ও রাষ্ট্রকে যেরূপ বোঝে, যেরূপ জানে বা অনুভব করে, নিজের স্বাধীন ভাষায় বল্‌বার অধিকার মানুষের আছে যতক্ষণ সে আইনের কবলে পতিত না হয়। এই নীতির প্রভাবেই অনেকের কাছে সাহিত্য আজ সুলভ ও সহজ হয়েছে।

ছেলে যদি রসিক হয় সমাজে তাকে বলে 'ডেঁপো' বা 'এঁচড়ে-পাকা'। ষাট্ বৎসরের বৃদ্ধ চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া মেয়ের পাণি গ্রহণ করলে আমরা তা'কে বলি রসিক। বয়স্কের গোপন বৈঠক এবং শ্বশুর বাড়ী ব্যতীত যুবকের মুখ খুল্‌বার অধিকার সমাজের অন্য কোথাও নেই। সমাজ প্রাচীনের,—তরুণের নয়। অতএব রস-সাহিত্যের সৃষ্টি ও অনুশীলনে তরুণ যে সমাজে নিন্দনীয় হবে—তা' স্বাভাবিক।

সাহিত্য সমাজের বৈঠকখানা। অন্দরেও দৃষ্টি চলে এবং বাইরের তত্ত্বও রাখা যায়। কোনো পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে Literature ought to be the barometre of the social atmosphere. অর্থাৎ সাহিত্য সমাজের আবহাওয়ার পরিমাপক যন্ত্র হওয়া উচিত। বস্তুতঃ, সাহিত্যের বুকে ভাসে সমাজের অন্দরের ভাল-মন্দ রসের ছাপ। সমাজ রসকে ভয় করে, শ্রদ্ধা করে, কিন্তু ভক্তি করে না। মহাকবি কালিদাস, দণ্ডী, শূদ্রক বাংলার ভারতচন্দ্র, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব প্রভৃতি কবিগণ এ কথার প্রমাণ।

মহাকবি কালিদাসের কথাই বলি। সমাজের কেউই তাঁ'কে ভালো চোখে দেখে নি। কাব্যের রস-মাধুর্য্যে সমাজ তাঁ'কে শ্রদ্ধা করেছে, কিন্তু ভজনা করে নি। অধিকন্তু আদি রসের আধিক্য দর্শনে ভীত হয়ে সমাজ চরিত্র-দোষের সত্য মিথ্যা কাহিনীর অবতারণা করে' তাঁর সামাজিক জীবনের খ্যাতি নষ্ট করে' দিয়েছে। রামীর জন্য চণ্ডীদাসকে সমাজে নির্য্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। পদ্মাবতীর সাহচর্য্যে জয়দেবকেও সমাজ সহ্য করতে পারে নি। ভারতচন্দ্রের সামাজিক জীবনের খ্যাতি ছিল কি না, বলা কঠিন। এই ভাবে সমাজ প্রাক্তন সাহিত্যের গতি যেমন নিয়ন্ত্রিত করতে চেষ্টা করেছে এখনও তেমনি বর্ত্তমান তরুণ সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করবার প্রয়াসী। সমাজ কবিকে ঋষি করতে চায়। কিন্তু কবি সব হ'তে পারে ঋষি হ'তে পারে না। মহর্ষি বাল্মীকি কাব্য হিসাবে রামায়ণ রচনা করলেও আমরা রামায়ণকে স্থান দিয়েছি মহাভারতের পার্শ্বে, রঘুবংশ কুমার-সম্ভবের পর্য্যায়ে নয়।

এক কালে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত বা বাংলা সাহিত্য রসে যে পরিপুষ্টি লাভ করেছিল, তার মূলে ছিল ছন্দ ভাষা ও ভাবের একটা রীতি, রসের অনবদ্যতা এবং অলংকারের একটা সমন্বয়ী-ভূত পদ্ধতি। এই রীতি, পদ্ধতির দোষে কাব্যের তারতম্য হ'তে পারে কিন্তু তা'র কাব্যত্ব নষ্ট হয় না। সুতরাং বর্ত্তমান তরুণ কথা-শিল্পীর রচনা যা' সাহিত্যের মাপকাঠি সাপ্তাহিক, মাসিকপত্রে মনোনীত হ'য়ে প্রকাশ লাভ করছে, তা' দোষ-দুষ্ট হ'লেও সাহিত্যের পর্য্যায়ে গৃহীত হয়েছে। তা'র সাহিত্যত্ব নষ্ট হয় নি।

"চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রাপ্তি সুখাদল্পধিয়ামপি"—বলে' প্রাচীন শাস্ত্রকার কাব্য থেকে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ ফল-প্রাপ্তির যে ব্যবস্থা দিয়েছেন, তা' ধর্ম্মের মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য এবং প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মপথে সাহিত্যকে পরিচালিত করাই ছিল সেকালের প্রাচীন শাস্ত্রকারের উদ্দেশ্য। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত যখন কেউ সাহিত্য-সেবা করে' চতুর্ব্বর্গের এক বর্গ লাভেও সমর্থ হয় নি, তখন সাহিত্যের উপরে ধর্ম্মের নামে সমাজ-নীতির প্রভাব বিস্তার করাই সে-উদ্দেশ্যের অন্তর্ভূত অভিপ্রায়। সাহিত্যের এই ধর্ম্মপ্রবণতা আধ্যাত্মিক যুগে শোভন হ'লেও বর্ত্তমান বস্তুতান্ত্রিক যুগে তা'র উপযোগিতা বিচার্য্য বিষয়। বর্ত্তমান সাহিত্যে ধর্ম্মের বালাই নেই, তাই সাহিত্যের উদ্দেশ্যই হয় শুধু সাহিত্যের সৃষ্টি—সাহিত্যিকের প্রয়াস। এবং এইটাই আধুনিক তরুণ শিল্পীর "আর্ট ফর আর্টস্ সেক" যুক্তির হেতুবাদ।

তাই, আজ বস্তুতান্ত্রিক যুগে আধুনিক কথা-সাহিত্যের রূপে সন্ত্রস্ত হয়ে যদি কেউ সমাজের চোখে তা'কে হেয় বা অসৎ প্রতিপন্ন করতে চা'ন' আমি বল্‌ব, তিনি নিতান্ত বে-রসিক।

সমাজের অন্দরে মানুষের সুখ দুঃখের ঘটনা যা' ঘটে তা'রই স্বরূপ নিয়ে গড়া হয় আধুনিক কথা-সাহিত্যের আখ্যান বস্তু। সমাজের নির্দ্দিষ্ট পথে যা' ঘটা উচিত বর্ত্তমান সাহিত্যে সে আদর্শের মূল্য কিছু নেই। আদর্শ যত উন্নতই হোক, চিরদিন সমাজের বাইরেই তা'র স্থান। যতই সে দূরে থাকে অলৌকিক সৌন্দর্য্যে ও গরিমায় সমাজকে ততই আকৃষ্ট করে, মোহিত করে। সমাজের জটিলতার মধ্যে আদর্শকে টেনে আন্‌লে তা'র সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হয়, গরিমা হয় বিলুপ্ত। তাই, সাহিত্যের প্রতাপ, শৈবলিনীকে ভালবেসে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে' আত্মবিসর্জ্জন দিয়েছিল,—সমাজের প্রতাপ ভালবাসার মোহে, বড় জোর, বালি-গঞ্জে লেকের জলে ডুবে মর্‌তে পার্‌ত বা নারী-হরণের মামলায় জেল খাট্‌তে পার্‌ত। এর বেশি কিছু করতে পার্‌ত না। সুতরাং, রসাস্বাদনের জন্যই সাহিত্যের সৃষ্টি। তার দ্বারা চিত্ত-বিনোদন ব্যতীত সমাজের অন্য কোন-কিছু হয় না। স্বীকার করি, দেশ, জাতি বা সমাজের জাগরণে সাহিত্যের একটা প্রভাব আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ", গর্কীর "মাদার" প্রভৃতি এই জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গস্বরূপ। কিন্তু এই জাতীয় সাহিত্যে অগ্রগতির পথে বাংলার তরুণ সাহিত্যের বহু বাধা বহু বিঘ্ন বিদ্যমান— যা' পূর্ব্বে ছিল না, অথচ এখন ঘটেছে। পরিবেশকের সঙ্গে ভোক্তার যে সম্বন্ধ, সমাজের সঙ্গে সাহিত্যেরও সেই সম্বন্ধ। ভোক্তার পরিপূর্ণ আনন্দেই পরিবেশকের যেমন তৃপ্তি ও সার্থকতা —সেখানে হিতাহিতের প্রশ্ন যেমন ওঠে না, তেমনি সামাজিক চিত্তে রতির উল্লাস উৎপাদন করে' সাহিত্য হয় তৃপ্ত ও কৃতার্থ। সমাজের হিতাহিত সাহিত্যের বিচার্য্য নয়।

কবি চিরনিরঙ্কুশ, সমাজের বাঁধন মানে না। সাহিত্যের বুকে যা' ভাসে তা' সমাজেরই প্রতিচ্ছবি! আপনার সেই ছায়া দর্শনে সমাজ যদি আতঙ্কিত হয়, তবে তা' সমাজের দৌর্ব্বল্যেরই পরিচায়ক।

তরুণ সাহিত্যের প্রধান আশ্রয় প্রেম। এর বিচার করলে দেখা যায়—

"ভদ্রং প্রেম সুখানুষঙ্গ কথমপ্যেকং হি তৎ প্রাপ্যতে।"

অনাবিল প্রেম ভাল লোকের কাছেও সুদুর্লভ। একমাত্র বিশ্বপ্রেম বা ভগবৎ প্রেম ব্যতীত প্রেম বল্‌তে আমরা যা' বুঝি, যত অনাবিলই হোক্, তার পশ্চাতে সম্ভোগের একটা অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষা থেকেই যায়। সে সম্ভোগ দৈহিক হ'তে পারে, জ্ঞান-সাধ্য বা অন্তরের অনুভূতি দ্বারা হ'তে পারে। সম্ভোগেচ্ছা মানব-মনের স্বাভাবিক বৃত্তি। বৈষ্ণব সমাজ পূর্ব্বরাগ মান মাথুর প্রভৃতি নানাভাবে প্রেমের অভিব্যঞ্জনা করে' যুগল-মিলন বা রাধাকৃষ্ণের পরমসম্ভোগেই পদ-কীর্ত্তনের পরিসমাপ্তি করে' থাকে।

এই প্রেম সাহিত্যে পরকীয় হ'য়ে চিত্তে যে রতির উল্লাস জন্মায় তাই হয় রস—আনন্দ। সুচতুর শিল্পী ভাষার আবরণে ভাবের শ্লীলতা রক্ষা করে' আখ্যান-বস্তুতে রস পরিবেশন করে' থাকে এবং যেখানে আবরণ—সেখানেই দর্শনের পিপাসা, অনু-ভূতির আকাঙ্খা জাগিয়ে বাড়িয়ে তোলে। তাই সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে তা'র রচনা হয় পরিপাটি।

যে-কাব্যে, যে-গল্পে, যে-উপন্যাসে সৃষ্টির সৌন্দর্য্য নেই, ভাষায় ধ্বনি নেই, ভাবে ইঙ্গিত নেই বা আখ্যান-বস্তু নয়—তা' সাহিত্য হ'লেও উপেক্ষনীয়—তার উপর বিচার চলে না।

শিল্পীর স্থান চিরদিন সমাজের বাইরে। যারা সত্যসুন্দরের উপাসক তা'রা সমাজের কঠোর বিধান মেনে চল্‌তে পারে না।

সমাজের মনে আনন্দ দিতে গিয়ে তা'র ক্ষতস্থানে সাহিত্যের হাত পড়ে। তাই সমাজ চমকে ওঠে। যাঁরা সামাজিক হিতা-হিতের প্রশ্ন তুলে হীন চক্ষে আধুনিক সাহিত্য নিরীক্ষণ ক'রে থাকেন, তাঁদের সমাজ সংস্কারে ব্রতী হওয়া উচিত। সাহিত্যের নিন্দায় সাহিত্যের সংস্কার সাধিত হয় না। যেদিন সংস্কারকের হাতে সমাজের এই ক্ষতস্থান পূর্ণ হয়ে উঠবে, সেদিন অদ্যকার সাহিত্য ভবিষ্যতের মহিমায় হ'বে উজ্জ্বল, সেদিন সাহিত্য সমাজের মূল্যবান সম্পদরূপে গড়ে' উঠবে। আমি আশাবাদী সেই ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে থাকব।

(প্রবন্ধটি পাবনা পাবলিক লাইব্রেরীর অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সভায় লেখক কর্ত্তৃক পঠিত হয়।)

চলতি

সত্যিই, যথার্থ প্রতিভার যথার্থ সমঝ্‌দার কোনোদিনই হয় না। তা' নইলে সজনীকান্ত দাসের মতো এতো বড়ো একটা একাধারে বহুমুখী প্রতিভার সমাবেশ কিনা দেশের লোক বুঝ্‌তেই পার্‌লো না। তাই বেচারা ঠিক ক'রেছে, তার একনিবিষ্ট সাহিত্য-সাধনার অমর্য্যাদা যে দেশের পক্ষে কতোখানি ক্ষতিকর, তা' সবাইকে হাড়ে-হাড়ে বুঝিয়ে দেবে। সাহিত্য-পরিষদের মাথায় হাত বুলিয়ে ভদ্রলোক বিলেতে যাবেন, পাস্‌পোর্ট তৈরী, কিন্তু শূন্য সিংহাসনে কে বস্‌বে? পরিমল?—ক্যামেরা নিয়ে গোঁসাইজী পলাতক। সবাই না-পাট দিয়ে ব'সেছে এই ব'লে যে এ রকম Ripe dove নাকি বাংলা কাব্য-শাখায় একেবারেই দুর্লভ।...সুতরাং দাস-বংশাবতংশ স্থির ক'রেছেন, যদি কেউ এগিয়ে না আসে, তবে তিনি মুর্‌গীকে তালা-চাবী আটকে রেখে যাবেন।

আমরা সেই মহাঘোরা শেষের সেদিনের অপেক্ষায় রইলাম—যেদিন মুর্‌গী ডাকবে না, Slave dynasty নিঃশেষিত, যেদিন অন্য সব পত্রিকা বেরোবে, বেরোবে না শুধু···আহারে! বাংলা সাহিত্যের সে কি দুর্দ্দিন!!

কিন্তু সজনীকান্ত আমাদের ভালোমানুষ পেয়ে ধোঁকা দিচ্ছেন না তো! তিনি যদি সত্যি-সত্যিই এদেশ ছেড়ে চলে' যান তা' হলে তাঁ'র ভাঁড়ত্বের অধিকার কাকে দিয়ে যাবেন? বিড্‌ন ষ্ট্রিটের চোতা কাগজটার ভাড়াটে সম্পাদকটি তো আদাজল খেয়ে ঐ অধিকার প্রতিষ্ঠা কর্‌তে লেগে গেছে!

* * * *

আমরা হেমেন রায়ের বয়েস জানবার জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলুম! দাদা নিজেই খানিকটা আভাষ দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, অশোক শাস্ত্রীর চেয়ে তিনি বয়েসে বড়ো। অশোক শাস্ত্রী! বলে কি? ভূষণ্ডি কাকের পের্‌মাই নিয়ে দাদা আমাদের চস্‌মার পরকলা নিয়ে ঘুরে বেড়ান, তাঁর সঙ্গে বয়েসের আস্পর্দ্ধা কোর্‌বে কে?

লেখক এবং সাহিত্যিক যেমন এক বস্তু নয়, তেমনিই chronological age-এর সঙ্গে mental age-এরও যে বিশেষ সম্পর্ক সব সময় থাকে না, একথা দাদাকে জানায় কে!

* * * *

শরৎচন্দ্রকে নিয়ে শেষ অবধি একটা ষাঁড়ের লড়াই না বেধে যায়! প্রবোধ সান্যাল, নরেন দেব, হেমেন রায়, অবিনেশ ঘোষাল, সৌরীন মুখুজ্জে,—এই ক'টি মহাপুরুষ এতদিন দাপাদাপি করে' বেড়াচ্ছিলেন; হালে আরেকটি পদ্মার ওপার থেকে ডাক ছেড়েছেন। এই ষষ্ঠ রত্নটি লিখেছেন, 'বাংলার অপরাজেয় কথাশিল্পী আজ আর ইহলোকে নাই, একথা ভাবিতেও আমরা সঙ্কোচ বোধ করি। তাঁহার তিরোধান···একটা প্রকাণ্ড বিস্ময়!'

এ রকম একদল উদো শুধু বাংলা সাহিত্যে কেন, পৃথিবীর যে-কোনো সাহিত্যেই একটি বিস্ময়।

* * * *

বিস্মরণী যদি আমাদের না পেয়ে বসে তাহলে আমরা বোল্‌বো একদা প্রমথ চৌধুরী বীরবলকে 'জাত-সাহিত্যিক' আখ্যায় আখ্যাত করেছিলেন। কিন্তু মোহিতলাল এই 'জাত-সাহিত্যিক' শব্দটাকে অশিক্ষিত ও ধর্ম্মজ্ঞান বিবর্জিত লোকের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

সাহিত্যের কমলবনে জাত-খাসীর উৎপাত ক্রমেই বেড়ে চল্‌লো দেখ্‌ছি!

* * * *

বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলাদেশের অদ্যাবধি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কি না, এ নিয়ে মতদ্বিধা থাকা স্বাভাবিক; কিন্তু স্মৃতি-সভা উপলক্ষ্য করে' কল্পিত বিরোধী পক্ষকে এ রকম তেড়ে গাল দিতে অবিশ্যি মোহিতলালই যে বাংলাদেশে অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠ 'সাহিত্যিক'—এ আমরা বোল্‌বোই। কিন্তু ভাব্‌ছি, একে এই গরম, তার ওপোর মাস্টার মশাই নিজের ছায়ার সঙ্গেই যে রকম কুস্তি লড়্‌তে সুরু করেছেন, তাতে তাঁর অনুরাগীদের শঙ্কিত হ'য়ে উঠ্‌বারই কথা।

—ঘানি

শ্রাবণের শেষ

রজত সেন

সহরের জীবন আবার ওদের গ্রাস করে' নিলে। সুবর্ণ রেখার তীর আর পাহাড়ের শ্রেণী সমস্ত ওদের মনে ঝাপ্সা হ'য়ে এলো।

চারুকুমার আবার যথারীতি দশটার সময় আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে নেক্‌টাই আঁট্‌তে লাগল। অমিয় ক'দিন আস্‌তে পারেনি, তার কলেজের কাজ বেড়েছে।

কিন্তু নিস্তরঙ্গ নদীতেও মাঝে-মাঝে ঝড় ওঠে।

কয়েকদিন পরে চারুকুমার বল্‌লে, 'শীলা, চশমাটা সেদিন চোট লেগে বেঁকে গেল বোধ হয়, অফিস-ফের্‌তা একবার চশমার দোকান হয়ে আস্‌বো, ভাল দেখ্‌তে পাচ্ছি না।'

চশমার দোকানে ওরা চশমা পরীক্ষা করে' বল্‌লে' চশমা তার ঠিকই আছে, খুব সম্ভব চোখ খারাপ হয়েছে আর একটু! চোখটা দেখানোই ভাল হবে।

বিলেত-ফেরৎ ডাক্তার ভাল করে' চোখ পরীক্ষা করে' বল্‌লে, 'আপনার কি বেরি-বেরি হয়েছিল ইদানীং?'

'চারুকুমার না চম্‌কে পারলে না, 'হ্যাঁ, কেন বলুন তো?"

'গ্লকোমা!'

'কি বল্‌ছেন?' চারুকুমার আর্ত্তনাদ করে' উঠ্‌লো, 'দেখেছেন ভাল ক'রে?'

'দেখেছি, কোন সন্দেহ নেই', ডাক্তার আর একজন রোগীর দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, 'এখনও সময় আছে, কালই puncture করিয়ে ফেলুন হাসপাতালে গিয়ে—'

'কিন্তু—'

'বেশ চালাক লোক আপনি, খুব তাড়াতাড়ি আমার কাছে এসেছেন। পরে অবশ্য চশমা বদলাতে হ'বে, তখন আস্‌বেন, খুব care নিয়ে দেখে দেব।'

'কিন্তু'—চারুকুমার বল্‌লে, ওর গলা একেবারে নিস্তব্ধ, 'শুনেছি 'গ্লকোমা' সারে না, বার-বার—'

'না, না, কে বল্‌লে সারে না?'

ডাক্তার কথার মাঝখানে বল্‌লে, 'সেরে যাবে বৈ কি! না সেরে যাবে কোথায়?'

চারুকুমার চশমাটা চোখে লাগিয়ে দাঁড়াল, সমস্ত গা তার কাঁপছে, হাত দুটো ঠাণ্ডা! নেক্‌টাই যেন গলাটা এঁটে ধরেছে। সে যখন ফুটপাতে এসে দাঁড়াল, তখন সহরের ওপর ঘনিয়ে এসেছে অপরাহ্নের ছায়া। সে চারদিকে ভাল করে' তাকিয়ে দেখ্‌লে: মনে হ'ল সব ঝাপ্সা; আকাশে যেন আর তেমন আলো নেই। রাস্তার ওপাশে মসজিদের চূড়োটাও যেন সে ভাল করে' দেখ্‌তে পাচ্ছে না। আশ্চর্য্য! সবই আছে পৃথিবীতে, শুধু কমে' আস্‌ছে তার দৃষ্টি-শক্তি। আস্তে-আস্তে, প্রতি মুহূর্ত্তে নিবে যাচ্ছে তার চোখের আলো। আবার সে তাকালো, সমস্ত অস্পষ্ট, ফিকে। এক সময়ে বাইরে যখন অজস্র আলো ঝল্‌মল্ করবে তখন তার চোখের ওপর পৃথিবীর সমস্ত অন্ধকার নিরেট, জমাট। কিন্তু এত অকস্মাৎ চোখের দৃষ্টি এমন ঘোলাটে হয়ে আস্‌তে পারে না কখনও। শরীরের সমস্ত স্নায়ুগুলোকে সে দৃঢ় করবার চেষ্টা করলো। ঐ ত স্পষ্ট সে দেখতে পাচ্ছে সমস্ত জিনিষ। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সে তাকাতে লাগ্‌লো চারদিকে। কৈ, সবই তার চোখের সামনে পরিস্কার! যে-সুদৃশ্য গাড়ীখানা চৌরিঙ্গী থেকে ধর্ম্মতলার দিকে মোড় ঘুরলো তার নম্বরটা দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্রই সে পড়ে' ফেলেছে। ঐ ত তার নিজের গাড়ীটা, প্রত্যেকটি অংশ সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখ্‌তে লাগ্‌লো। ডাক্তার গর্দ্দভগুলোর হাল-চালই এমনি। গলায় কিছু হলেই বল্‌বে ক্যান্‌সার, পেটের ডানদিকে ব্যথা অনুভব করলেই বল্‌বে, গল-ষ্টোন, কন্‌সটিপেসন হলেই বল্‌বে, অবসট্রাকসন্।

চারুকুমার গাড়ীতে উঠে বস্‌লো।

কিন্তু পরদিন সহর ভালো করে' না জাগ্‌তেই সে উঠ্‌লো জেগে; তাকে মেডিক্যাল কলেজে আস্‌তে হ'ল, সঙ্গে অমিয় এবং শীলাবতী।

'শেষকালে আমার বরাতেই এটা ছিল কে জান্‌তো বল!' চারুকুমার সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করেছে বিনিদ্র। প্রভাতে সূর্য্যের আলো না দেখা পর্য্যন্ত সে স্থির হ'তে পারছিল না।

'ভয় কি?' শীলাবতী ওর একখানা হাত কোলের ওপর তুলে নিলে, 'আমি ত রয়েছি।'

'সে জন্যেই ভয় নেই শীলা' চারুকুমার ম্লান হাস্‌লো, 'চিন্তা কিন্তু তোমার জন্যে!'

শীলাবতী সমস্তদিন হাসপাতালে রইল তার সঙ্গে। অমিয় মাত্র দু'ঘণ্টা ক্লাস নিয়েছে।

দুপুরে অপারেশন্ হ'ল। সহজ ব্যাপার, জটিল কিছু নয়।

'কেমন?' অমিয় জিজ্ঞেস করলো ডাক্তারকে। তার

উৎকণ্ঠা ডাক্তারের কান এড়ালো না। 'অল-রাইট। যান না আপনারা ভেতরে!'

ওরা একরকম প্রায় ছুটেই গেল দেখ্‌তে। চোখের ওপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা! শীলাবতী অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো।

'চুপ।' অমিয় ওর একখানা হাত তুলে নিয়ে বল্‌লে।

চারুকুমার শুয়ে ছিলো নিস্পন্দের মত, যেন আহত এক সৈনিক।

'কি হে! কেমন আছো?' অমিয় কাছে এসে বল্‌লে।

পাশে একটা নার্শ ছিলো, সে বিনীত কণ্ঠে বল্‌লে, কথা তারা হু'একটা বল্‌তে পারে বটে, কিন্তু বেশী নয়।

চারুকুমারকে স্ট্রেচারে করে' তার নিজের ক্যাবিনে নিয়ে যাওয়া হ'ল। একবার সে মাথাটা নাড়লে, তার সমস্ত সত্ত্বা কাকে যেন খুঁজছিলো।

শীলাবতী বসলো শিয়রে। 'শীলা?' চারুকুমার জিজ্ঞেস করলো।

'হুঁ! কেমন আছো?'

'ভালো!'

'ভালো হয়ে যাবে, ভয় নেই!' শীলাবতীর গলার স্বরটা কেঁপে উঠ্‌লো।

ভালো সে হয়ে উঠ্‌লো; কয়েক দিনের মধ্যেই বাড়ী এলো। আবার অফিস, খেলার মাঠ, সিনেমা। মনের আকাশে তাদের রামধনুর রঙ্‌ বদলাতে লাগ্‌লো। অফিস ফেরৎ চারুকুমার একদিন সেই চোখের ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানিয়ে এলো।

কিন্তু ভালো সে বেশীদিন থাকতে পারলে না, আবার চোখে ঝাপ্সা দেখ্‌তে লাগ্‌লো। তার মুখ গেল শুকিয়ে, হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন থেমে যাবে হঠাৎ।

ডাক্তার পরীক্ষা করে' বললে, 'এখুনি, আজই অপারেশন করা দরকার।'

আবার হাসপাতালে অপারেশন করা হ'ল। ডাক্তারও যথারীতি বল্‌লে, 'অল-রাইট।'

কয়েকদিন পরে হাসপাতাল থেকে সে বাড়ী এলো।

দিনগুলো তার অসহ্য হয়ে উঠেছে। চোখের দৃষ্টি আস্‌তে লাগ্‌লো ঝাপ্সা হ'য়ে। কল্‌কাতা ছেড়ে তারা আবার কিছুদিনের জন্য গেল হাওয়া পরিবর্ত্তনে। মন যেখানে পরিবর্ত্তিত হবার নয়, হাওয়া-পরিবর্ত্তন সেখানে কোন্‌ কাজে আস্‌বে?

চোখ তার ভালো হ'ল না। আরও কয়েকবার puncture করবার পর সে একেবারে অন্ধ হয়ে গেল। একেবারে সম্পূর্ণ অন্ধ। চোখের বাহ্যিক অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয়নি, শুধু কেমন যেন নিষ্প্রভ, জ্যোতিহীন।

'শীলা' চারুকুমারের পাথরের মত দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগ্‌লো।

সে বসেছিলো চেয়ারে, শীলা গিয়ে দাঁড়ালো তার পেছনে, মাথাটা টেনে নিলে বুকের মধ্যে। সম্মুখ থেকে সে তাকাতে পারে না চারুকুমারের দিকে; সে-সাহস তার নেই। কোথায় গেল ওর চোখের দৃষ্টি-শক্তি? শীলাবতীর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো, সে মুখ রাখ্‌লে চারুকুমারের চুলের মধ্যে। সে পারে না, আর পারে না সহ্য করতে!

'আমি ভাবিনি কোনদিন আমার এমন হ'বে!' চারুকুমার বল্‌তে পারলে, 'যদি শুধু তোমাকে দেখ্‌তে পেতাম শীলা, পৃথিবীর আর যা-কিছু না দেখবার দুঃখটা সহ্য করতে পারতাম।'

'এই ত আমি রয়েছি, তোমার শীলা, এই ত!'

'তুমি কি চিরকাল আমার বোঝা বয়ে বেড়াতে পারবে? কোনদিন তোমার ক্লান্তি আসবে না? বল, বল শীলা?'

'পারবো, নিশ্চয়, তোমার জীবন আর আমার জীবন আলাদা নয়!'

'কিন্তু আমার যে চোখ নেই শীলা।' যেন কান্নার ঢেউগুলো শীলাবতীর মনের উপকূলে আছাড় খেয়ে পড়তে লাগলো।

শীলাবতী চট্‌ করে' ঘুরে সামনে এলো, চারুকুমারের দুটো হাত নিয়ে নিজের চোখের ওপর রেখে বল্‌লে, 'এই ত, এই ত তোমার চোখ!'

কয়েক মাস অতিবাহিত হ'ল। আবার বুঝি দিন ওদের সহজ হয়ে এলো, জীবন হ'য়ে এলো স্বচ্ছন্দ।

অমিয় আসে প্রতিদিন। এটা তার নিত্য কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চারুকুমারের সঙ্গে গল্প করে, তাকে বই পড়ে' শোনায়। কখনও কখনও শীলাবতীকে দিতে হয় সান্ত্বনা। অমিয় তাদের জীবনকে সহজবহ করে' তুলেছে।

একদিন বিকেলে- তখনও অমিয় আসেনি—শীলাবতী বল্‌লে, 'শোনো না!'

'কি?' চারুকুমার জিজ্ঞেস করলো।

'ব্যাপার!' শীলাবতী ওর গলা জড়িয়ে ধরলো।

'বল না, কি ব্যাপার!'

কাছে নেই কেউ, তবু শীলাবতী চারুকুমারের কানের ওপর মুখ রেখে কি বল্‌লে।

'সত্যি?' চারুকুমার জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ গো!'

চারুকুমারের সমস্ত মুখ এক মুহূর্ত্তে সাদা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। প্রশান্তর কপালে দেখা গেল ভ্রূকুটি-চিহ্ন। কিন্তু শীলাবতী বুঝতে পারলে না, কিসের জন্যে ওর এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন।

'কি হয়েছে?' শীলাবতী জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কি আনন্দ হচ্ছে না?'

চারুকুমার নিরুত্তর। তাকে দেখাচ্ছিলো একটি পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির, নিষ্কম্প। শীলাবতী হঠাৎ ওর কাছ থেকে সরে' এলো কয়েক পা। ওর মুদিত চোখের প্রতি চেয়ে সে বিস্মিত হ'ল।

শীলাবতী পুনরায় একান্ত নিকটে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কি আনন্দ হচ্ছে না?'

চারুকুমার নিরুত্তর।

'তোমার কি বল্‌বারও কিছু নেই?' আবার সে নিস্তেজ গলায় বল্‌লে।

'আমার কি বল্‌বার থাক্‌তে পারে, আমি ত অন্ধ!'

'কিন্তু আজ—তোমারই ত বল্‌বার কথা!'

'আমার!' শীলাবতী নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলে না, 'আমার আবার কি বল্‌বার থাক্‌তে পারে এতে? পৃথিবীর কাছে, তোমাদের কাছে আমি অনাবশ্যক।'

শীলাবতীর বুক কেঁপে উঠ্‌লো। কথাগুলো অভিমানের নয়, দুঃখের নয়। সে তাকালো চারুকুমারের দিকে। এক মুহূর্ত্তের জন্যে লজ্জায় সে মুখ নামালে, মনে তার জমে উঠ্‌লো দুঃখ, অন্তরে দুর্ব্বার অভিমান। দ্বিতীয়বার সে তাকাতে পারলে না চারুকুমারের দিকে। সে চলে' যাচ্ছিলো বাইরে, যাবার আগে আর একবার তাকালে বিস্মিত দৃষ্টিতে, কৌতূহলের সীমা নেই যেন, বিস্ময়ের অবধি নেই। সমস্ত সহানুভূতি তার মিলিয়ে গেল মন থেকে। সে ঘর থেকে বাইরে এলো।

সিঁড়িতে ভারি জুতোর শব্দ শোনা গেল, আর ঘ্রাণ পাওয়া গেল কড়া চুরুটের গন্ধের। শীলাবতী মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে দাঁড়ালো। অমিয় ওপরে উঠে নীচু গলায় জিজ্ঞেস করলে, 'ও কোথায়?'

শীলাবতী নিঃশব্দে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। অমিয় যাচ্ছিলো, হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, 'কি হয়েছে তোমার শীলা?'

'কৈ, কিছু ত হয়নি।'

'শরীর ভালো নেই বুঝি?'

শীলাবতী কোন উত্তর দিলে না, ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ করলো।

অমিয় বাইরে থেকে দেখ্‌তে পেলো চারুকুমার অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে বসে' আছে। মুখের রেখাগুলো কঠিন।

'কি হয়েছে তোমাদের?' অমিয় আর একখানা চেয়ার টেনে বস্‌লো।

'কিছু হয়েছে বলে' মনে হচ্ছে তোমার?' মৃদুকণ্ঠে চারুকুমার উত্তর দিলে।

'মনে হচ্ছে বলেই ত জিজ্ঞেস করছি, শীলাকে ডাক্‌লাম, সে বিশেষ কোন কথা বল্‌লে না; সে-সব যা হয় কর তোমরা। একটা কথা আছে, আজ হ'ল একুশে মার্চ্চ; আজ আমি দুপুরে কলকাতার বাইরে যাচ্ছি, এপ্রিলের দশ তারিখ—শীলা গেল কোথায়? শীলা! শীলা!' অমিয় উঁচু গলায় ডাকলে। শীলা এলো। তেমনি মন্থর তার পদক্ষেপ, শান্ত দৃষ্টি; মুখ দেখ্‌লে মনে হয়, মনে জমেছে আষাঢ়ের মেঘ। অমিয় মনস্তত্ত্বকে ভয় করে, পাশ কাটালে। 'আজ আমি বাইরে যাচ্ছি শীলা; ফিরতে আমার কয়েকদিন দেরী হবে, দিন সাতেক। দশই এপ্রিল সকালবেলা, কৈ, একটা ক্যালেণ্ডার? এ-ঘরে ত ছিল, কি বার হয় সেদিন? তোমরা তৈরী হয়ে থাক্‌বে, আমি আস্‌বো। সাবধানে থেকো, আর আমার সময় নেই।' অমিয় বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

শীলা এলো চারুকুমারের কাছে, চারুকুমার ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিলো। মুখে তার কোন ভাবান্তর নেই। সঙ্কোচ-মুক্ত হ'তে শীলাবতীর কয়েক মুহূর্ত্ত লাগলো। 'কোথায় যাচ্ছেন উনি?' সহজ গলায় সে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমাকে বল্‌লেন না?'

চারুকুমার সোজা হয়ে বসলো, 'আমাকে? নাঃ, আজকাল আমাকে সব কথা বল্‌বার দরকার সে বোধ করে না, তবে তোমাকে বল্‌তে পার্‌তো!'

উত্তর দেবার ছিলো, উত্তর সে দিচ্ছিলো, কিন্তু সাম্‌লে গেল। বল্‌লে, 'চল, তোমার স্নানের সময় হয়েছে, এসো।'

'এখন স্নান করতে ইচ্ছে করছে না, চুপ করে' বসে' থাক্‌তেই ভাল লাগছে।'

শীলাবতী পীড়াপিড়ি করলো না আর; তার কাজ ছিলো।

সেদিন সন্ধ্যার পর অমিয়কে দেখা গেল হাওড়া ষ্টেশানে, বম্বে মেলে উঠ্‌ছে; মুখে চুরুট এবং হাতে লাঠি।

আজ দশই এপ্রিল। এ কয়েকটা দিন ওদের কেটেছে নিঃশব্দ, নির্ব্বিঘ্ন। চারুকুমারের মনে হ'ল: চিন্তার প্রয়োজন নেই কিছু, অমিয় যেখানে যাবে যাক্‌। ওর তাতে এসে যায় কি? তার সঙ্গে সম্বন্ধ কা'র? এ পৃথিবীতে সে একা, ভয়ানক একা। কিন্তু শীলাবতী আজ সকাল থেকেই একটু আনন্দিতচিত্ত। কয়েকটা ঘণ্টা তারা অতিবাহিত কর'ল উত্তেজনা এবং আগামী বিস্ময়ের মধ্যে!

'তোমায় আর একটু চা দেবো?' শীলাবতী জিজ্ঞেস করলো।

'নাঃ!' চারুকুমারেরও দিনগুলো অতিবাহিত হয়েছে।

'আজ অমিয়বাবু আস্‌বেন বলেছিলেন না ?' চা'টা চমৎকার তৈরী হয়েছে আজ ? 'আস্‌তে পারে !' চারুকুমার জবাব দিলে।

'রেখে দাও এক পেয়ালা অমিয়ের জন্যে।' ওর চোখ যদিও ভাষাহীন, কণ্ঠে প্রেম—এসেও পড়তে পারে ! ও আবার কথাবার্ত্তা-গুলো খুব রাখতে জানে।

শীলা কি বল্‌তে যাচ্ছিলো, সিঁড়িতে জুতোর শব্দে কেঁপে উঠ্‌লো তার বুক। চারুকুমারের মন সচকিত হয়ে উঠ্‌লো, উদ্‌গ্রীব হ'ল চিত্ত।

'কি হে কেমন আছো তোমরা ?' অমিয় ঘরে ঢুক্‌লো, 'এই যে ! চা কি শেষ না কি ? দাও আমায় এক পেয়ালা।'

'দিচ্ছি ! শীলাবতী ঝলমল করে' উঠ্‌লো, 'কেমন আছেন ?'

'খুব ভালো, কি হে চারু স্বাস্থ্য কেমন ?'

'ভালই ত !' মৃদু হাস্যে চারুকুমারের মুখ ঈষৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌লো।

'ঠিক দশটার সময়', অমিয় বল্‌লে, 'আমি হাজির হবো ডাক্তার নিয়ে।

'আবার কি ডাক্তার ?'

চারুকুমারের চোখের পাতা নড়ে' উঠ্‌লো, এখন আর ডাক্তার কি হ'বে ?'

'ডাক্তারই ত সব, বম্বে গিয়েছিলাম এই ডাক্তারকে নিয়ে আস্‌তে, পার্শী। প্যারিস্ থেকে এ-সব রোগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হয়ে এসেছেন। ঠিক করে' এলাম সব। এখন ক'টা ? আটটা বোধ হয় !'

'কিন্তু কৈ, টাকা ত নিয়ে যান নি ?' শীলাবতী বিস্মিত হ'ল।

'টাকা ? কৈ, চা দাও।'

'এই যে ! দিচ্ছি।' শীলাবতী স্থানান্তরে গেল।

ঘড়ির কাঁটা দশটার ঘরে পৌছবার সতেরো মিনিট যখন বাকী, নীচে গাড়ী বারান্দায় মোটর থামলো।

চারুকুমার শুন্‌তে পেলো সে-শব্দ, এক মুহূর্ত্তের জন্যে চম্‌কে উঠ্‌লো।

'ভাল হবে না আমার চোখ' সে প্রায় আর্ত্তকণ্ঠে বলে' উঠ্‌লো, 'এ আমি জানি, অনর্থক টানাটানি।'

শীলাবতী দাঁড়িয়েছিলো পাশে, বল্‌লে, 'ভালো হবে, নিশ্চয় ভালো হবে। ভয় পেয়ো না লক্ষ্মী !'

'কিন্তু কি হবে আমার ভালো হয়ে' এ একরকম মন্দ নয়, সমস্ত জগত অন্ধকার, হয়তো পরে দুঃখ পাবো অনেক বেশী, সে দুঃখ সহ্য করবার ক্ষমতা হয় তো আমার থাক্‌বে না।'

শীলা কি বল্‌তে যাচ্ছিল। অমিয় ডাক্তার নিয়ে ঘরে ঢুক্‌লো।

অপারেশন শেষ হ'ল। ডাক্তার তার সমস্ত যন্ত্রপাতি নিয়েই এসেছিলো সঙ্গে ক'রে। যাবার সময় বলে' গেল : অপারেশন যে ভাবে হওয়া উচিত ঠিক সে ভাবেই করা হয়েছে, তবে ভয়ানক advanced case, খুব বেশী নিশ্চয়তা নেই। সাত দিনের মধ্যে নড়াচড়া বন্ধ, আর চোখের বাঁধন যেন কোনক্রমেই খোলা না হয়।

সাত দিন অতিবাহিত হ'ল। চারুকুমার মৃতের মত পড়ে' রইলো শব্দহীন, নিস্পন্দ। তার মনে হয়েছে, তার দেহের ওপর যেন কফিনের ডালা ; নিরেট, নিষ্ঠুর। আর শীলাবতীর চোখে ঘুম নেই। যেন যুগ যুগ সে চারুকুমারের শিয়রে অপেক্ষা করছে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব এবং ভয়-ভাবনার দোলা নিয়ে। যেন কোন দেবতার জন্যে অপেক্ষা করছে তাঁকে বন্দনা এবং অর্চ্চনা করবার আকাঙ্খা নিয়ে। অনাগত যে-দেবতার আরাধনায় দেহের প্রতিটি তন্ত্রী উন্মুখ হয়েছিলো।

সহকারী ডাক্তার শায়িত চারুকুমারের ব্যাণ্ডেজ স্পর্শ করা মাত্রই সে অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌লো। অমিয় এগিয়ে এসে তার একখানা হাত তুলে নিয়ে বল্‌লে, 'ভয় নেই, এই ত আমরা রয়েছি, এই ত শীলা। এখন সকাল, ন'টা হবে, তুমি দেখ্‌তে পাবে সব, ভোরের আলো, গাছ পালা, শীলাকে'—

'একটু সরে' আসুন !' ডাক্তার বল্‌লে।

অমিয় আর শীলা পাশাপাশি দাঁড়ালো।

'জানলা দরজাগুলো সব বন্ধ করে' দিন !' ডাক্তার বল্‌লে, 'হঠাৎ এত আলো সহ্য করতে পারবেন না ! দৃষ্টি শক্তির হানি হ'তে পারে।'

শীলা দরজা জানলা সব বন্ধ করে' দিলে। জ্বালিয়ে দিলে একটা নীল সেডের আলো।

ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ খুল্‌তে লাগ্‌লো আস্তে-আস্তে, অতি সাবধানে। শীলা অমিয়র হাত চেপে ধরলো, ঠোঁট দুটো তার কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো।

'চোখ খুলুন এবার !' ডাক্তার বল্‌লে।

চারুকুমার চোখ খুল্‌লে। সমস্ত ঘরে অস্পষ্ট, স্তিমিত আলো। সেই আলোকে সে দেখ্‌তে পেলো, শীলাবতী আর অমিয় হাত ধরাধরি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে তার একান্ত নিকটে। শরতের মেঘের মত তার মন থেকে উড়ে চলে' গেল সন্দেহের ছায়া। একবার সে তাকালো পায়ের কাছে বন্ধ জানালাটার দিকে। বাইরে নীল আকাশ। তার দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগ্‌লো। হাতটা বাড়িয়ে দিলে সে তাদের দিকে। অমিয় এসে দাঁড়ালো মাথার কাছে। শীলাবতী তার প্রসারিত হাতখানা তুলে নিয়ে মুখটা নামিয়ে আন্‌লে ওর কপালের ওপর !

ছোটো কবিতা

হীরালাল দাশ-গুপ্ত

মদ

"But you, sir, had better take wine ere your
departure" Rihaku.

জীবনের অবিস্মৃত গূঢ়তম পাপের মতোন
ভারাক্রান্ত নিশীথ তমিস্রা !
হঠাৎ বড়ো বড়ো শব্দ কোরে নামলো বৃষ্টি !
(য্যামোন দিনে বৃষ্টি হওয়া ভালো,
পাঁজিতে লেখা আছে !)
তোমার বর্ষাতি কই ?
যাবার আগে য্যাক পেগ্ মদ খেয়ে যাও বন্ধু !
দুর্য্যোগের রাত্রি—
দীর্ঘ বন্ধুর পথ—
যাত্রী তুমি য্যাকা !
যাবার আগে য্যাক পেগ মদ খেয়ে যাও বন্ধু !

ঘুমন্ত হাত

"She lay beside me in the dawn" Ezra Pound.

সোবুজ ঘাসের ডগায় ডগায় রাত্রি-শেষের সাদা শিশির !
অসহ্য আনন্দে রোমাঞ্চিত আকাশ !
দূর সমুদ্রে জাহাজের শব্দ !
উপত্যকার ভেজাপদ্মের পাপ্‌ড়ির মতোন
আমার বুকের ওপর তার ঘুমন্ত হাত
ঠাণ্ডা
করুণ।

প্রার্থনা সেন

"Lugete, veneres ! Lugete, Cupidenesque"

বালীগঞ্জের বিখ্যাত সুন্দরী প্রার্থনা সেন
যার শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে অনির্ব্বচনীয় অনিশ্চয়তা
যার কুটীল-কটাক্ষে ভক্তের মুহূর্ত্ত-মৃত্যু,
শেষকালে বে' কোরলো কিনা য্যাক দাঁতের ডাক্তারকে !

কথা

আমি কি তার সাথে বোকার মতো কথা কোয়েছি ?
যে-সব কথা বলা উচিৎ হয়নি হয়তো
প্রথম দিন ?
দ্বিতীয় দিন ?
কিন্তু যাবার সময় সে বোল্‌লে :
কাল আস্‌বেন্ কিন্তু,
ঠিক এমনি সময়,
ক্যামোন ?

চিত্রলেখা

"Thou restless, thou ungathered" Ezra Pound.
আমি তোমায় ভালোবাসি,
লেখা, ওগো চিত্রলেখা !
তোমার পাত্‌লা দুটী ঠোঁট,
তোমার ছোট্টো দুটী বুক,
ওগো চঞ্চলা,
ওগো অসম্বৃতা !

স্পোর্টের পোর্টফোলিও

হকি—

বেটন কাপের খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। কিছুদূর না এগুলে কাপটি কে নেবে তা স্পষ্ট ক'রে বলা যায় না। তবে কর্ম্মকর্ত্তারা আগন্তুক দলগুলির তুষ্টিবিধানের ব্যবস্থা করে' আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এই ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতাটির ভবিষ্যৎ উজ্জল হয়ে উঠবে, কারণ বড় বড় দলকে এখানে টেনে আনবার জন্যে এ ব্যবস্থা অপরিহার্য্য।

হকি লীগ শেষ হয়ে গেছে। যেমন আশা করা গেছল, কাষ্টমস্ চ্যাম্পিয়ন হলই। রেঞ্জার্স শেষ খেলায় তাদের হারাতে পারলনা। এই নিয়ে কাষ্টম্সের পনেরবার লীগবিজয় হল। রেঞ্জার্স জিতেছে সাতবার। লীগের শেষস্থান অধিকার করেছে টাউন ক্লাব। তারা একটি খেলাতেও জিততে পারেনি। মাত্র ছটি খেলায় ড্র করেছে। লীগের প্রথম পাঁচটি দলের স্থান এই রকম ভাবে হয়েছে—

					গোল		
	খেলা	জিত	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
কষ্টম্স্	১৮	১৫	৩	০	৪৪	৫	৩৩
রেঞ্জার্স	১৮	১৩	৫	০	৪৯	৭	৩১
মোহনবাগান	১৮	১২	৪	২	২৭	৭	২৮
পোর্ট কমিশনার্স	১৮	১০	৭	১	২০	৯	২৭
মিলিটারি মেডিক্যাল্স্	১৮	১০	৫	৩	২৬	১১	২৫

মহামেডান স্পোর্টিং ষষ্ঠস্থান অধিকার করেছে। এইখানে আমাদের আশা ফলবতী হয়নি। শেষের কয়েকটি খেলায় তারা আশানুরূপ খেলতে পারেনি। পোর্ট কমিশনার্স-এর কাছে মোহনবাগানের হারে আমরা বিস্মিত হইনি। এর জন্যে দায়ী তাদের নতুন গোলকিপার। অথচ তার আগে পর্য্যন্ত পুরনো মুখার্জ্জি গোটা সিজ্‌নে মাত্র চারটি গোল খেয়েছিলেন।

ক্রিকেট—

ক্রিকেট প্রসঙ্গ এসময়ে অপ্রাসঙ্গিক। তবে এটা আগামী শীতকালের কথা। আমাদের সুপরিচিত মিষ্টার ফ্র্যাঙ্ক ট্যারাণ্ট আবার জানিয়েছেন যে প্রয়োজন হলে' এবারও তিনি একটি শক্তিশালী অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল ভারতে নিয়ে আসতে পারেন। তাঁর প্রস্তাব সমস্ত প্রাদেশিক ক্রিকেট প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৭ই এপ্রিল দিল্লীতে নিখিল ভারত ক্রিকেটের বোর্ড অব কন্ট্রোলের যে অধিবেশন হবে তাতে এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে। তিনি যে পঁচিশ জন অষ্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়ের নাম দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন আমাদের খুবই সুপরিচিত, যেমন,—

ডন্ ব্র্যাড্‌ম্যান, রিচার্ডসন, গ্রিমেট্, কিপ্‌প্যাক্স্, ওল্ডফিল্ড, ওয়েওেল্ বিল্, ফিঙ্গ্‌ল্টন্, ম্যাক্‌কর্মিক, ব্রম্‌লে, চিপারফিল্ড, পন্‌সফোর্ড ও ফ্লিট্‌উড্‌স্মিথ।

আরও যাঁরা আছেন তাঁরাও অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট-জগতের নব নক্ষত্র। কিন্তু এঁদের সকলকে মিষ্টার ট্যারাণ্ট্ আনতে পারবেন কি না সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। গতবারেও প্রতিশ্রুতিমত সকলকে আনতে পারেন নি। তবু যেদল এনেছিলেন তাঁরাও দুর্ব্বল ছিলেন না—যদিও তাঁরা বহুবার ভারতে হেরেছিলেন। বিভিন্ন দেশের মধ্যে এইরকম যাতায়াতে দেশগুলি নানা উপায়ে উপকৃত হয়। তবে প্রতিশ্রুতির অর্দ্ধেকও যদি সফল হয় তাহলে তার চেয়ে আশার কথা আর কিছুই হতে' পারে না। অন্তত ব্র্যাড্‌ম্যানের খেলা দেখবার আমাদের অনেক দিনের ইচ্ছে।

টেনিস—

একটি ভারতীয় দল যে ডেভিস কাপ খেলার জন্যে ইউরোপে পৌছেছে এখবর জানেন নিশ্চয়ই। সম্প্রতি তাঁরা গ্রীসের প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছেন। পুরুষদের সিঙ্গল্‌সে তৃতীয় রাউণ্ডে সোহনি গ্রীসের নিকোলাইডিস্‌কে ৬-১, ৬-১এ হারিয়েছেন। ডাবল্‌সের তৃতীয় রাউণ্ডে সোহনি এবং রণবীর সিং ইটালীর স্তিফানি এবং কারিয়ানিকে ৬-২, ৬-২এ হারিয়েছেন। কাউণ্ট দি স্তিফানি যে ইটালীর একজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় একথা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন।

ফুটবল—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং ক্যানাডায় যে ইংলিসদলের খেলতে যাবার কথা ছিল শেষ পর্য্যন্ত তা আর হয়ে' উঠলনা। আমেরিকা টাকা তোলবার জন্যে রবিবারেও খেলবার জিদ্ ধরেছিল এবং ইংল্যাণ্ড সে-জিদ্‌কে প্রশ্রয় দিতে রাজী হয়নি।

— স্পোর্টস্‌ম্যান

স র মা পি ক্ চা র্সে র

প্রযোজনা : গণেশরঞ্জন

"মায়া-মৃগ"

কাহিনী : চারু বন্দ্যো

প্রতীক্ষিত প্রথম অভিবাদন

FOR MODERN PLANNING OF :
Factories, Estates, Gardens, Parks, Roads, Canals, etc., etc.

FOR MODERN DESIGNS OF :
Cinemas, Schools, Temples, Masjids, Swimming baths, Public buildings, Memorials, Residential houses, Factory-buildings, etc., etc.

CONSULT

BETON ARME

Architects and Reinforced Concrete Engineers,
9, Old Post Office Street, Calcutta.

MANAGING DIRECTOR

KAPIL P. BHATTACHARYYA, *B.E. (Cal. Univ.),*
CIVIL ENGINEER

(Specialised in reinforced concrete engineering under MM. Perret Freres and Compagnie Generale d'Entreprise in Paris, France.)

কলিকাতা কর্পোরেশন

ঘোড়ার গাড়ী ও ঘোড়ার ট্যাক্স ১৯৩৮-৩৯ সালের প্রথমার্দ্ধ বৎসর

এতদ্বারা ঘোড়ার গাড়ী, জিন, রিকশা, রেসের ঘোড়া, টাটু, ঘোড়া বা খচ্চরের মালিকদিগকে ও উহাদের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে জানান যাইতেছে যে, মালিক বা ভারপ্রাপ্ত হিসাবে তাঁহাদের নিকট যতগুলি যান বা পশু আছে তাহার সংখ্যা ও তজ্জন্য তাঁহাদের ট্যাক্সের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া ১৯২৩ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৬৭ (১) ও (২) ধারা অনুসারে তাঁহাদিগকে একটি বিবৃতি ১৯৩৮ সালের ১লা মে তারিখের পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যাল অফিসে দাখিল করিতে হইবে। ঐ প্রকার বিবৃতির নিমিত্ত মুদ্রিত ফার্ম্মের জন্য সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসে লাইসেন্স অফিসারের নিকট দরখাস্ত করিলে পাওয়া যাইবে। এতদ্বারা আরও জানান যাইতেছে যে, ঐ প্রকার বিবৃতি দাখিল না করিলে তাঁহাদিগকে আদালতে অভিযুক্ত করা যাইতে পারিবে এবং এজন্য ২০ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে। যাঁহারা সুবিধা মনে করেন তাঁহারা নিজ নিজ স্থানেই তাঁহাদের নিকট প্রাপ্য ট্যাক্সের টাকা লইয়া তৎক্ষণাৎ লাইসেন্স দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টারের নিকট দিতে পারেন। গাড়ী ব্যবহৃত না হওয়ার জন্য ট্যাক্স রেহাই পাওয়ার দরখাস্ত ১৯৩৮ সালের ৩০শে জুনের পর আর গ্রহণ করা হইবে না।

গরুর গাড়ী রেজিষ্ট্রেশন

১৯২৩ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৮৩ ধারা অনুসারে চলতি বৎসরার্দ্ধের জন্য অর্দ্ধ বাৎসরিক রেজিষ্ট্রেশন ১লা এপ্রিল হইতে আরম্ভ হইবে। গরুর গাড়ী এবং হাতে ঠেলা গাড়ী যাহা মানুষ যাত্রী বহনার্থ ব্যবহৃত হয় না, সেই সমস্তের মালিকগণকে অবিলম্বে রেজিষ্টারী করিতে বলা যাইতেছে। প্রত্যেকখানি গাড়ীর জন্য রেজেষ্টারী ফী বাবদ ৪ টাকা দিতে হইবে। গাড়ীতে নম্বর সংযুক্ত প্লেট মারার জন্য প্রত্যেক স্থলেই আরও এক টাকা অতিরিক্ত দিতে হইবে।

গরুর গাড়ী চালকদের টিকিট

উক্ত আইনের ১৮৭ ধারার বিধান অনুসারে গরুর গাড়ীর চালকদিগকে কর্পোরেশন নম্বরযুক্ত টিকিট (প্রদর্শনার্থ) সঙ্গে রাখিতে হইবে।

কুকুরের ট্যাক্স

উক্ত আইনের ১৭৩ ধারার বিধান অনুসারে কলিকাতায় রক্ষিত প্রত্যেক কুকুরের উপর বার্ষিক ৫৲ টাকা করিয়া ট্যাক্স ধার্য্য এবং কুকুরের মালিক বা ভারপ্রাপ্ত হিসাবে তাহাদের নিকট যে সমস্ত কুকুর আছে তাহার তালিকা ১লা মে তারিখের পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যাল আফিসে দাখিল করিতে হইবে এবং সেই সময় প্রত্যেক কুকুরের জন্য দেয় ট্যাক্স কর্পোরেশনে দিতে হইবে। ঐ ফী দিলে চলতি বৎসর কুকুর রাখার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হইবে এবং কলারের সহিত আঁটিয়া রাখার জন্য বা অন্য কোন রকমে কুকুরের গলায় ঝুলাইয়া রাখার জন্য নম্বরযুক্ত একটি টিকিট দেওয়া হইবে। যদি কোন কুকুরের গলায় নম্বরযুক্ত টিকিট ঐরূপ আঁটা বা ঝুলান না থাকে, তবে উহাকে আটক করা বা মারিয়া ফেলা যাইতে পারে।

ভাস্কর মুখার্জ্জি, কর্পোরেশনের সেক্রেটারী। সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৩৮ সাল।

বছরের নতুন দিনে
মনে রাখবেন

বাসক-সুধা, নার্ভিটোন,
প্যারা গ্লুকোনেট,
ট্রাইফোলিন এবং
থাইমো গ্লিসারিন

আপনার সব সময়েই
দরকার হ'তে পারে

ক্যালকাটা ফার্মাসিউটিক্যাল
ওয়ার্কস্ লিঃ

১৭৭বি, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাসন্তী লাইব্রেরী

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

১৫১—১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এখানে স্কুল-পাঠ্য এবং অন্যান্য যাবতীয় পুস্তক পাওয়া যায়। সকলপ্রকার মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা বিক্রয় হয়।

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

হাকিম এম, এস, জামানের
আদি ও অকৃত্রিম
কস্তুরী পিল
পবিত্র ও উৎকৃষ্ট
গভর্মেন্ট হইতে রেজিষ্টারী কৃত
ধাতুদ্দৌর্ব্বল্য ও শক্তিহীনতা চিরতরে আরোগ্য করিয়া যৌবনোচিত শক্তি ও আনন্দ প্রদান করে। মূল্য ২৲
৪২ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট পোঃ বক্স ৮৯০৫ কলিকাতা

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'

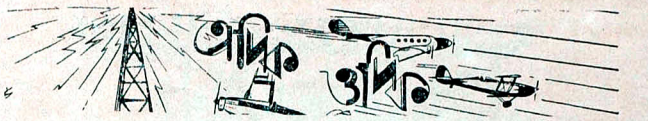

বিহার সরকার জানিয়েছেন যে, 'পথের দাবী' বিহারে বাজেয়াপ্ত নয়।

মন্ত্রীসভার পতন

মঁশিয়ে ব্লুমের নেতৃত্বে গঠিত ফরাসী মন্ত্রীসভা মুদ্রামান সম্পর্কিত বিলের ভোটাভুটিতে হেরে গিয়ে পদত্যাগ করেছে। মঁশিয়ে দালাদিয়ের তাঁর স্থানে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করেছেন।

বিহিটা দুর্ঘটনার জের

বিহিটার নিকটে পাঞ্জাব মেল দুর্ঘটনার তদন্ত কোর্টের জজ স্যার জন টম তাঁর রায়ে বলেছেন যে, ঐ দুর্ঘটনার জন্য রেল কোম্পানীর অসতর্কতাই প্রত্যক্ষ কারণ। এবং এই জন্যে নিহত ১০৭ জন ও আহত ১১৭ জন যাত্রীকে বা তা'দের পরিবার-বর্গকে রেল কোম্পানী ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য।

ভারত-সরকার নাকি এই রায় দেখে খুসী হ'ননি। কারণ ভারত-সরকারের পরিচালিত ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলোয়ের অসতর্কতার অভিযোগ তাঁদের সুনামের হানিকর।

শতকরা তেত্রিশ

বাংলা-সরকারের শিক্ষা বিভাগ কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে সুপারিশ করেছে এই মর্মে যে অতঃপর মুসলমানদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা তেত্রিশটি নোক্‌রী দিতে হবে।

বাংলাদেশের কংগ্রেস

বাংলাদেশের কংগ্রেস কমিটি ও তা'র কার্য্য-নির্বাহক সমিতির নির্বাচন হয়েছে। সুভাষ বসু প্রেসিডেণ্ট এবং তিনজন অধুনামুক্ত রাজবন্দী ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, একজন মুস্‌লিম ভদ্রলোক সেক্রেটারী এবং তিনজন ভূতপূর্ব রাজবন্দী তার সহকারী হয়েছেন। বিভিন্ন দলগুলির সঙ্গে আপোষনামা স্বরূপ এমন একটা কার্য্য নির্বাহক সমিতি গঠিত হয়েছে যাতে কিনা সকল দলেরই লোক রয়েছে।

চীনের খবর

চীনা সৈন্যেরা সম্প্রতি জাপানীদের এক ধার ইস্তক্ হঠিয়ে দিচ্ছে। হাজার হাজার জাপ-সৈন্যকে চীনারা একেবারে 'কচু কাটা' করে' দিচ্ছে। এবং এর ফলে, দেখা যাচ্ছে, যে বৃটিশ জাতের লোকজনের ওপর জাপানীরা আর মনুষ্য-অনুচিত ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছে।

সোভিয়েট্ রাশ্যা

বৃটিশরা তো গিয়ে ফ্যাসিস্ট্‌দের সঙ্গে আঁতাত সুরু করে' দিলো: এই ভেবে, সোভিয়েট্ রাশ্যা ইস্তাহার দিয়ে জানিয়েছে যে তারা একাই জার্মানী ইতালী পোল্যাণ্ড্ ও জাপানের সঙ্গে লড়্‌তে ও লড়ে' জিত্‌তে সক্ষম। নব্বই লক্ষ সৈন্যকে নাকি তা'রা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে' ফেলেছে।

সাংবাদিক সম্মেলন

নিখিল বঙ্গীয় সাংবাদিক সম্মেলন আগামী ১৩ই ও ১৪ই মে তারিখে চট্টগ্রাম সহরে বস্‌বে।

জার্মান গণ-ভোট

অস্‌ট্রিয়ার সঙ্গে জার্মানীর মিশে যাওয়া এবং নতুন শাসন-ব্যবস্থা-পরিষদে হিট্‌লার মনোনীত প্রার্থীদের সম্পর্কে জার্মান জনগণের অভিপ্রায় সম্পর্কে এক গণভোট গ্রহণ করা হয়। শতকরা নিরানব্বই জন লোক হিট্‌লারের মতে মত দিয়েছে; অথবা বলা যেতে পারে, প্রায় সাড়ে পাচ কোটি জার্মান নরনারীর মধ্যে অন্যূন পঞ্চাশ লাখ জার্মান হিট্‌লারের মতবাদের বিরোধী। কল্‌কাতায় একজন এবং বোম্বাইয়ে দু'জন জার্মান হিট্‌লারের বিপক্ষে ভোট দিয়েছে।

জিন্না-কংগ্রেস সংবাদ

আগামী ফেডারেশনে কংগ্রেস নানা কারণবশত মুস্‌লিম লীগের সহযোগিতা-কামী। মুস্‌লিম লীগের নেতা জিন্না সাহেবের সঙ্গে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের চিঠিপত্র চলেছিল। সম্প্রতি লীগ-নেতা জিন্না সাহেব একটা দাবীর ফিরিস্তি দাখিল করেছেন, যা' মেনে নিলে মুস্‌লিম লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা কর্‌তে পারে। এই দাবীগুলি হচ্ছে এই রকম:

১। কংগ্রেসকে গণ-সংযোগের নীতি ত্যাগ কর্‌তে হ'বে।

২। যুক্ত নির্বাচনপ্রথা সমর্থিত হবে না।

৩। কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ পতাকার সমান মর্য্যাদা দিতে হবে মুস্‌লিম লীগের পতাকাকে।

৪। 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত বর্জন কর্‌তে হ'বে।

৫। হিন্দি ভাষার প্রচার বন্ধ কর্‌তে হ'বে। এবং আরো দু'টো সাধারণ দাবী রয়েছে। কংগ্রেস মহল থেকে এখনো অবধি এই দাবীগুলি সম্পর্কে কোনো মতামত প্রকাশিত হয়নি।

['অগ্রগতি'র 'আমোদের আবহাওয়া'য় একেবারে চতুর্থশ্রেণীর কোনো নাটক বা ছায়াচিত্রের সমালোচনা প্রকাশিত হয় না।]

মঞ্চের খবর

ক্যালকাটা থিয়েটার্স

গত পয়লা বৈশাখ ক্যালকাটা থিয়েটার্সের উদ্বোধন হয়ে গিয়েছে চিৎপুরের রঙ্গমহল রঙ্গমঞ্চে। অধ্যাপক মন্মথ বোস উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেন—কোলকাতার থিয়েটার জগতে আজ দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছে। একদা বাংলার রঙ্গালয় যে গৌরব অর্জন করেছিল, আজ যে-কোনো কারণেই হোক তা' আর নেই···ইত্যাদি। কথাটা খুবই সত্যি। শিশিরকুমার সাধারণ রঙ্গালয়ের সম্পর্ক ছেড়ে দেবার সঙ্গে-সঙ্গে বাংলায় নাট্যজগত যে ছন্নছাড়া হোয়ে গিয়েছে এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যে-সব কারণের জন্য বাংলার থিয়েটারে আজ ভাঙন ধরেছে তার আলোচনা আমরা একাধিক-বার করেছি। নট, নাট্যকার ও নাট্যালয়—এই তিনের যোগাযোগেই ভালো থিয়েটারের সৃষ্টি হয়। দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানে এদেশে না আছে তেমন নাট্যকার, না আছে উচ্চ আদর্শের নাট্যালয়। যে কাম্পেনী-মনোবৃত্তি নিয়ে এদেশে সাধারণ রঙ্গালয়ের সৃষ্টি, তার মোহ আমরা আজও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠ্‌তে পারি নি। শিশিরকুমার তাই সেদিন বল্‌ছিলেন—এদেশের থিয়েটারের উন্নতি অসম্ভব—যতদিন না এই মনোবৃত্তি থেকে আমরা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হ'তে পারছি।

এখন কোলকাতায় পাঁচটা থিয়েটার। পাঁচটা থিয়েটারের যায়গা কোলকাতায় নেই—তিনটে ঠিক চল্‌তে পারে। সবারই বিজ্ঞাপন—শ্রেষ্ঠ নট-নটী সম্মেলন। এই শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের মানদণ্ড যে কী তা কেউ ভেবে দেখে না একবার!

যশোদা ঘোষ এই ক্যালকাটা থিয়েটার্সের পরিচালক এবং তাঁর পরিচালনায় অনেক নট-নটীই সন্তুষ্ট। থিয়েটার টিঁকে থাক্‌বার পক্ষে এ একটা মস্ত বড় কথা। মনোরঞ্জন, ভূমেন, পশুপতি, সরযূবালা প্রভৃতি এখানে যোগদান করেছেন। নাট্য নিকেতনে ক্যালকাটা থিয়েটার্সের যেসব বই অভিনীত হয়েছে, এখানেও আপাতত সে-সব বই অভিনীত হবে। আমরা এঁদের সাফল্য কামনা করি সর্ব্বান্তঃকরণে।

পর্দ্দার খবর

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

শ্রীযুত নীতিন বসুর পরিচালনায় এঁদের 'দেশের মাটী' চিত্রের কাজ সমাপ্তির মুখে অগ্রসর হচ্ছে।

'অভিজ্ঞান' চিত্রের কাজও প্রায় শেষ হ'য়ে এল। হিন্দী 'অভিজ্ঞান' যা'তে আগামী মে মাসের প্রথমেই বাঙ্‌লার বাইরে মুক্তিলাভ কোরতে পারে তার জন্যে কর্তৃপক্ষ খুবই চেষ্টা কোরছেন। বাঙ্‌লা সংস্করণও খুব শিগ্‌গির রূপবাণী চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ কোরবে।···বিনয় গোস্বামী ও কমলা ঝরিয়ার ('বৈষ্ণব' ও 'বৈষ্ণবী'র ভূমিকায়) গান 'অভিজ্ঞান' চিত্রের অন্যতম আকর্ষণ।

পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া তাঁর আগামী ছবি 'অধিকার'-এর চিত্রগ্রহণে আবার হাত দিয়েছেন। তাঁর এই ছবির কাহিনীটি মূলত গড়ে' উঠেছে মার্জ্জিতরুচি আধুনিক তরুণ-তরুণীর সামাজিক-জীবন ও বিচিত্র ভাবধারাকে কেন্দ্র কোরে। 'অধিকার'-এর শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় কোরছেন—প্রমথেশ বড়ুয়া,

যমুনা, মেনকা, পাহাড়ী, চিত্রলেখা, পঙ্কজ মল্লিক, শৈলেন চৌধুরি, ইন্দু মুখার্জি প্রভৃতি। আবহ-সঙ্গীত ও কণ্ঠ-সঙ্গীতের পরিচালনা কোরছেন তিমিরবরণ। দৃশ্যসজ্জার ভার নিয়েছেন শিল্পী অর্জ্জুন রায়।

পরিচালক অমর মল্লিক 'বড়দিদি' চিত্রের শিল্পী-নির্বাচন পর্ব একরকম শেষ কোরেছেন। ভূমিকা-লিপি আপাতত এই রকম হয়েছে:

মাধবী—মলিনা (বাঙলা ও হিন্দী)
সুরেন্দ্র—পাহাড়ী (")
সুরেন্দ্রর পিতা—শৈলেন চৌধুরি (বাঙ্‌লা)
ঐ — বিক্রম কাপুর (হিন্দী)
শান্তি—চন্দ্রাবতী
মনোরমার স্বামী-ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়
মথুরাবাবু—ইন্দু মুখোপাধ্যায়

'বড়দিদি'র এই ভূমিকা-লিপি দেখে', সত্যি কথা বোলতে কি, আমরা খুব খুসি হলুম না। আমাদের সব চাইতে আপত্তি 'সুরেন্দ্র'র ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যালকে মনোনীত করায়। অমন একটি পাণ্ডিত্য-পূর্ণ, শান্ত অন্তর্মুখী গভীর চরিত্রকে রূপ দেবার জন্য কি কোরে যে পাহাড়ীকে নির্বাচন করা হ'ল, আমরা কিছুতেই ভেবে পাই না।

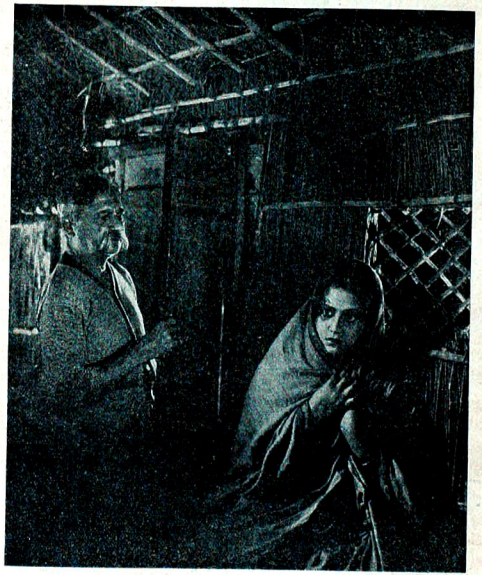

নিউ থিয়েটার্সের 'অভিজ্ঞান' চিত্রের 'সন্ধ্যার' ভূমিকায় মলিনা

পাহাড়ীর দ্বারা সূক্ষ্ম ও গভীর রসের অবতারণা যে একেবারেই অসম্ভব, এ-কথা আমরা 'বিদ্যাপতি'র ভূমিকা-নির্বাচনের সময় বোলেছিলুম, এখনও বোলছি। এখনও সময় আছে, পরিচালক মল্লিক ম'শায় ও নিউথিয়েটার্স আমাদের এ-কথাটি একটু ভেবে দেখবেন আশা করি।···'বড়দিদি'র মহলা আরম্ভ হ'য়ে গেছে।

তরুণ পরিচালক ফণী মজুমদারের আন্তরিক প্রযত্নে 'ষ্টিল সিঙ্গার'-এর কাজ ধীরে-ধীরে অগ্রসর হচ্ছে।

এই শনিবার থেকে 'চিত্রা'য় 'বিদ্যাপতি'র তৃতীয় সপ্তাহ আরম্ভ হ'ল।

সরমা পিকচার্স

এই নতুন প্রতিষ্ঠানটি চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যমুনা পুলিনে ভিখারিণী'র কাহিনী অবলম্বনে 'মায়া-মৃগ' নামে একখানি বাংলা ছবি তুলছেন। অরোরা ষ্টুডিয়োতে 'মায়া-মৃগের' চিত্রগ্রহণ প্রায়

সরমা পিকচার্সের 'যমুনা পুলিনে ভিখারিণী'র চিত্ররূপ 'মায়া-মৃগে'র একটি দৃশ্যে যূথী ও ফণী

শেষ হ'য়ে এল। প্রযোজক গণেশরঞ্জনের সুস্থ শিল্প-বোধ ও পরিচালক কালীভূষণের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা ছবিখানিকে সফল কোরে তুল্‌তে সমর্থ হবে—এমনি সংবাদ পেলাম। 'মায়া-মৃগ'র চিত্রনাট্য, ডায়ালগ ও সঙ্গীত রচনা কোরেছেন যথাক্রমে পরিচালক কালীভূষণ ও উদীয়মান কবি সুশীলকুমার।

আগরা ও গোয়ালন্দ-র বহির্দৃশ্যগুলি ইতিমধ্যেই গৃহীত হয়েছে। নায়কের অন্তরের জন্য কয়েকটি অন্তর্দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ আপাতত স্থগিত আছে। আমরা এই নতুন প্রতিষ্ঠানটির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা কোরছি।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স

একটি বিরাট থিয়েটার-ষ্টেজ ও অডিটোরিয়ামের সেট্ তৈরি হচ্ছে বোলে এঁদের 'অভিনয়' চিত্রের অন্তর্দৃশ্যগুলির চিত্রগ্রহণ আপাতত স্থগিত আছে। সেদিন মহারাজা ত্রিপুরার বাড়ীতে ও রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের বাগান-বাড়ীতে কয়েকটি বহির্দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ করা হয়েছে। প্রকাশ, আর কয়েকটি দৃশ্যের কাজ শেষ হ'লেই ছবিখানি পর্দায় মুক্তিলাভ কোরতে পারে।

—প্রবীর চৌধুরি

—'অগ্রগতি' আশু চট্টোপাধ্যায় এডিট্ করেছেন—আর ৬৬, কৈলাস বোস ষ্ট্রীটের 'অগ্রগতি প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং ওয়ার্কস্' থেকে তিনিই ছাপিয়ে বের করেছেন।

সুর-শিল্পী ঃ
রাই বড়াল

চিত্র-শিল্পী ঃ
ইউসুফ মুলজী

শব্দ-যন্ত্রী ঃ
লোকেন বসু

৩য় সপ্তাহের
বিজয় অভিযান

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোহ পিরিতি অনুরাগ বখানইত, তিলে তিলে নূতন হোয়॥

অনুভবের প্রতিশব্দ নাই। অনুভব ধারণা করিতে, বুঝাইতে পারা যায় না। সেই সর্ব্বলোক-বিদিত, চিরস্মরণীয়, অনুপমেয়, অসীম অতৃপ্তির পীযূষপূর্ণ মর্ম্মবাণী কে ভুলিতে পারে? ছায়া-চিত্রে কথা ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়া সেই বাণী আপনার মর্ম্ম স্পর্শ করিবে।

চিত্রা

ফোন ঃ বড়বাজার ঃ ১১৩৩

বুধবার, ১৩ই এপ্রিল হইতে সোমবার ১৮ই এপ্রিল পর্য্যন্ত
প্রত্যহ তিনবার প্রদর্শন ঃ—৩, ৬।০ ও ৯॥০

দুইদিন পূর্ব্বে আসন সংগ্রহ করিবেন।

শিগ্‌গির বেরোবে

আশু চট্টোপাধ্যায়ের

স্বামী নেই বাড়ী

(নানান্ টেক্‌নিকে অভিনব গল্প সমষ্টি)

দাম : এক টাকা

•

দিনেশ দাসের

ঘুমন্ত সহর

(কবিতার বই)

দাম : এক টাকা

অ্যাসোসিয়েটেড্ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক্ লিঃ

হেড অফিস—
২নং লায়ন্স্ রেঞ্জ
কলিকাতা

শাখা সমূহ—
আসানসোল
ও
পাবনা

ফোন : ক্যাল্—৪০০৭

* বাজার চল্‌তি শেয়ারের কাজ
* বিদেশে যাবার বন্দোবস্ত
* উপযুক্ত জামিনে টাকা ধার
ও
* সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং-এর কাজ করা হয়

একটি অভিমত

'অগ্রগতি' বলেন :

"নিউ হাফটোন কোম্পানীর তৈরী লাইন, হাফটোন প্রভৃতি যাবতীয় ব্লক সুধু যে নিখুঁত হয় তা' নয়—অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে এত সুন্দর ব্লক এঁরা করেন যে এঁদের দায়িত্বজ্ঞান ও সুদক্ষতার প্রশংসা না কোরে পারা যায় না।"

নিউ হাফটোন্ কোম্পানী

১, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট,
ফোন, কলিকাতা ৫৫৭০

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

৩য় বর্ষ, ২২শ সংখ্যা—১৭ই বৈশাখ ১৩৪৫

বান্‌জাই ! বান্‌জাই !!

কবি সিংহ

প্রাচ্য দুটো পাশাপাশি দেশ যে পরস্পরের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ সুরু করে' দিয়েছে, এ রকমটা এশিয়ার আধুনিক ইতিহাসে নিতান্তই দুর্লভ। ১৯০১ সালে জাপান কর্তৃক কোরিয়া অধিকার করা, ১৯০৫ সালে জাপ-রুশ্ যুদ্ধ এবং ১৯৩৩ সালে জাপ-চীন সংঘর্ষ,—এসিয়ার ইতিহাসে অধুনাতন কালে এই তিনটি সংঘর্ষ ছাড়া আর কোনো বিশেষ যুদ্ধ ঘটেনি।

জাপানী সৈন্যরা চীনের রণক্ষেত্রে চলেছে

সুতরাং দেখা যাচ্ছে জাপানই একমাত্র দেশ, যে কিনা অপর তিনটি দেশের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয়েছে। এতে কি প্রমাণ হয়?—না, প্রমাণ হয় যে জাপানের ভেতরেই হয়তো এমন কোনো বিষয় রয়েছে যা' তা'কে প্রতিবেশী রাষ্ট্রদের সঙ্গে গোলযোগে প্রবৃত্ত করিয়েছে। এই বিষয়টি, আমার এবং অনেক নাম্‌জাদা বিদেশী রাজনীতিবিদ্‌দের মতে হচ্ছে গিয়ে, জাপানের ভয়াবহ সাম্রাজ্যলিপ্সা। 'ভয়াবহ' বল্‌ছি এই কারণে যে, জাপানের সাম্রাজ্যলিপ্সা পূর্ব এসিয়ার অন্যান্য দেশগুলিতে রীতিমত আতঙ্কের সঞ্চার করেছে।

সম্প্রতি ছোট একটা কারণ উপলক্ষ্য করে' জাপান যে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করেছে তা'র মূলেও আছে এই সাম্রাজ্য-বৃদ্ধির পাশবিক ইচ্ছা। সমগ্র প্রাচ্য দেশ থেকে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ আধিপত্য প্রভুত্ব এবং প্রভাবকে বিদূরিত কর্‌বার জন্য জাপানী রাষ্ট্রনেতারা যেন একরকম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়েই উঠেছে। চীন বিগত প্রায় এক শতাব্দীকাল যাবৎ পাশ্চাত্যের ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী এব… মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবের আওতায় অল্পবিস্তর রয়ে… চীন নানাকারণ বশতই নিজের রাষ্ট্রকে স্বাবলম্বী ক… প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে পারে নি, এবং এর মূলে আছে তা… জাতিগত দারিদ্র্য এবং নেতাদের চিত্তদৌর্বল্য। পাশ্চা… রাষ্ট্রগুলি চীনের এই আভ্যন্তরীন দুর্বলতার সুযোগ… সদ্ব্যবহার কর্‌তে দ্বিধা করেনি। ফলে, ধীরে ধ… চীনে পাশ্চাত্য-প্রভাব এবং রাষ্ট্রিক অর্থ-নৈতিক অধিকার কা… হয়ে' বসেছে। জাপান ওদিকে গেল কয়েক বছর যাবৎ স্বাত… বাড়িয়ে তুল্‌ছিল, বর্তমান কালে সে পাশ্চাত্যের জাতিদের তুল… কিছুমাত্রই নিকৃষ্ট নয়। সুতরাং যা' অবশ্যম্ভাবী, তা' ঘট্‌… অর্থাৎ প্রভাববিস্তারের ক্ষেত্র নিয়ে জাপানীদের সঙ্গে লা… পাশ্চাত্য-শক্তিপুঞ্জের প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে বিরোধ। কি… পাশ্চাত্য-শক্তিপুঞ্জ নিজেদের দেশের অনেক দূরে এবং সমশ… মান জাপানের একেবারে দরজার গোড়ায় এসে তা'রই … লড়্‌তে অনিচ্ছুক। তারপর আর এক ব্যাপার আছে : সাম্রা… বাদী রাষ্ট্ররা পরস্পরের মধ্যে বিসম্বাদ করতে রাজী নয়, কেননা —সাধারণ শত্রু কম্যুনিজ্‌ম্-এর বিরুদ্ধে এরা সবাই একজোট। এখন, চীনের সঙ্গে যুদ্ধে যদি জাপান সোজাসুজি জিতে যায়, তা' হ'লে এই পাশ্চাত্য শক্তিগুলির পক্ষে তো নিদারুণ পরিস্থিতি! আর যদি চীন কম্যুনিস্ট্‌দের সহায়তায় জাপানকে হঠিয়ে দেয়, তা' হ'লে একদিকে যেমন নিজেদের একটি প্রতিযোগী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের দাপট কমে—অন্যদিকে আবার তেমনি বিজয়ী চীন থেকে নিজেদের পাত্‌তাড়ি গুটোবার আশঙ্কাও আছে। সাম্রাজ্য-

বাদের দর্পণে বলে যে চীন এবং জাপান উভয়কেই হয়তো রাখা কর্তব্য।

সুতরাং যদি জাপান এই যুদ্ধে জেতে, তা' হ'লে তা'র সঙ্গে আপোষ করে' চীনকে নিয়ে নিজেরা ভাগবাটোয়ারা করে' নিতে পারবে। আর যদি চীন জেতে, তা' হ'লেও তা'কে হাতে রাখা দরকার; কারণ এক ব্রিটেনেরই প্রায় দু'শো কোটি টাকা চীনে ব্যবসায় বাণিজ্য উপলক্ষ্যে খাটছে। এই টাকাটা মারা না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে।

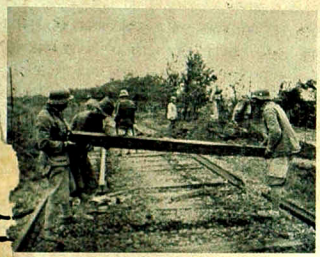

চীনা সৈন্যরা রেল লাইনে বাধা ফেলে জাপ সৈন্যর অগ্রগতিতে বধা দিচ্ছে

অতএব, জাপান বনাম চীন যখন এসিয়ার পূর্বপ্রান্তে সামরিক ধর্ষের দৃশ্যের অবতারণা করেছে, তখন বাইরের interested গুলি লোকচক্ষুর আড়ালে আড়ালে যে কোন্ কোন্ স্বার্থের দায় কি কাজ করে' চলেছে তা' নিরপেক্ষ দর্শকের পক্ষে তা সম্ভবপর নয়।

জাপান সাম্রাজ্য-বিস্তার চায়,—এ কথাটার মানে এই নয় যে জাপানের আপামর জনসাধারণ চীন দেশ জয় করতে চায়। বস্তুতপক্ষে প্রত্যেক দেশের ইতিহাসেই দেখা গিয়েছে যে স্বার্থান্বেষী মুষ্টিমেয় কতিপয় লোকের মৎলবঅনুযায়ী বিভিন্ন দেশের মধ্যে যুদ্ধ বেধেছে। একথা বলাই অনাবশ্যক যে বর্তমান-কালের গণতান্ত্রিক দেশ সমূহে রাষ্ট্রব্যবস্থায় নেতৃত্ব করে' থাকে প্রধানত বিশেষ এক শ্রেণী, যা'রা কিনা দেশের ফ্যাক্টরী মিল ও অন্যান্য অর্থ-উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মালিক। এই সব পুঁজিদাররাই তা'দের মাল কাট্‌তির বা কাঁচা মাল সরবরাহ করবার উপযুক্ত দেশ নিজেদের কতৃত্বাধীনে আন্‌তে রাষ্ট্রের যাবতীয় বাসেন্দাকে মিথ্যা কতগুলি বুলি বা স্লোগানের সাহায্যে যুদ্ধোন্মাদনা দিয়ে থাকে।

জাপানেও বিগত কিছুকাল থেকে পুঁজিদারদের মাতব্বরী রাষ্ট্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ইওরোপীয়ান দেশগুলির প্রতিযোগিতার থেকে বিমুক্ত করে' চীনকে বা তা'র অংশবিশেষকে নিজেদের অধীনে আন্‌তে চায়। ১৯০৫ সালে রুশ-জাপ যুদ্ধ এবং ১৯০১ সালের কোরিয়া-বিজয় এবং মাঞ্চুকে 'রাষ্ট্রের'(!) পত্তনের মূলে এই জাপানী পুঁজিদারদের লালসাই ছিল।

এরা জাপানী জনসাধারণকে একটা মিথ্যা দেশাত্মবোধের ধোঁকা দিয়ে চীন-জাপ লড়াই সুরু করে' দিয়েছে।

বান্‌জাই! বান্‌জাই!!

চিরকালের মূর্খ মূঢ় জনসাধারণ যুদ্ধদেবতার হাড়িকাঠে স্বামী পুত্র ও ভাইকে বলি দেবার জন্য যুদ্ধসাজ পরিয়ে চীনে পাঠিয়ে দিল। তা'রা বুঝ্‌তে পারল না যে-চীনের বিরুদ্ধে

শ্যাংহাইতে গৃহহীন বিপন্ন নরনারীরা

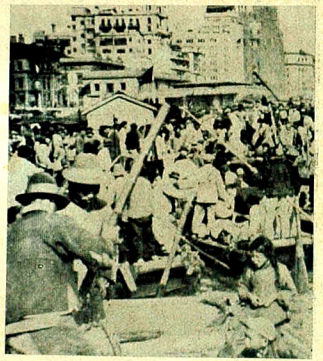

তা'দের যুদ্ধ, সেখানেও তা'দেরই মত বহু লক্ষ নরনারীকে গৃহহীন করে' লক্ষ লক্ষ স্বামী পুত্র ও ভাইয়েরা বিনা কারণে—নিজেদের কোনও দোষ না থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র বিদেশী কয়েকটা স্বার্থপর লোকের বিত্তকে আরও বর্দ্ধিষ্ণু করবার জন্যেই প্রাণ হারাতে বসেছে!

শোনা যায়, জাপানে লোকসংখ্যা বেড়ে গিয়েছে; এই বর্দ্ধমান জনতার অন্ন এবং বস্ত্রের সংস্থান জোটাবার জন্যেই জাপানকে

রাজ্য-বিস্তারে মনোনিবেশ করতে হয়েছে! ইতালীতেও লোক-সংখ্যা বেড়েছিল, অ্যাবিসিনিয়াকে সেই বাড়্‌তি ইতালীয়ানদের বাসস্থান দিতে হয়েছে! মেয়েদের শরীরের সন্তানোৎপাদনের ক্ষমতাকে দ্রুততর করে' পরোক্ষে তা'দের প্রতি যন্ত্রের মতোই মর্যাদা (!) দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই বাড়্‌তি জনতাকে কি অন্যত্র পাঠানো যেত না? দক্ষিণ অ্যামেরিকায় তো সত্যিই লোকাভাব।

কিন্তু এই সাম্রাজ্যবাদী মনুষ্যচর্মাবৃত সভ্যতা ও মানবতার শত্রুরা তা' চায় না। জমির ভোগদখল সাম্রাজ্যবাদের এক লক্ষণ। চীনের বৃহৎ ভূভাগকে জাপানী ব্যবসায়ীদের উৎপাদিত মালবিক্রয়ের বাজার এবং কাঁচা মাল আহরণের নিরুপদ্রব জায়গীর হিসেবে অধিকার করবার মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই চীন-জাপ মূলের রহস্য।

চীনা শিল্পীর চোখে মরীয়া চীনা সৈন্য

কিন্তু জাপানী সমর-লালসের রক্তমেঘের পেছনে যে অসন্তোষ, যে বিপর্যস্ত মনুষ্যত্ববোধ জাপানী জনগণ, বিশেষ করে' জাপানী যৌবন-সমাজের মধ্যে জেগে উঠছে, তা'র খবর সতর্কতা সহকারে চাপা দিলেও বেরিয়ে আসছে। যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সহস্র সহস্র যুবক যুবতীকে বিনাবিচারে ও অনির্দিষ্ট-কালের জন্য আট্‌কে রাখা হয়েছে, যেমন হয়েছে কোরিয়ায় ও জার্মানীতে। আর জাপানের নারী-সমাজের মধ্যে একাংশ আজ অবধি প্রাণপণে জাপানের যুদ্ধসজ্জার বিরোধিতা করে' এসেছে; নানাভাবে তা'রা বস্ত্র অন্ন এবং অন্যবিধ সাহায্য বিপন্ন চীনা নর-নারীর উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র-নেতাদের চোখ এড়িয়ে পাঠাচ্ছে।

বিপন্ন চীনের আপামর জনসাধারণ আসন্ন ধ্বংস থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষা করবার বদ্ধপরিকর প্রতিজ্ঞা নিয়ে সর্বতোভাবে বাধা দিচ্ছে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বর্বর দানবতাকে। তা'দের নির্বিরোধী প্রপীড়িত অন্তর আজ চিৎকার করে' বল্‌ছে, "নিরস্ত্র জনতার ওপর—শিশু ও নারীর ওপর—পাশবিক অত্যাচার সাধন করে' আর আকাশ থেকে বোমা ফেলে, বিষাক্ত গ্যাশ ছড়িয়ে, শস্যক্ষেত্রকে পুড়িয়ে দিয়ে, জাপানীদের এই যে সভ্যতার বিরোধী অভিযান চলেছে, এ কেবলমাত্র চী... দুর্যোগ নয়। একে একটা বিচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা ব... মনে করলে ভুল বোঝা হ'বে। কাল অ্যাবিসিনিয়াতে ঠি... এই ঘটনাই ঘটেছিল, আজ চীনে ও স্পেনে এই ঘটন... পুনরাবৃত্তি চলেছে।...আর আগামী কাল..."

...কে জানে সাম্রাজ্যবাদের বর্বর পশুশক্তি এর পর কো... দেশে আত্মপ্রকাশ করবে!

বর্বর পাশবিকতা আবার ফিরে' এসেছে সাম্রাজ্য... ট্যাঙ্ক্, বম্বার, গ্যাশ ও মাস্ক্-এর ছদ্মবেশে। মনুষ্যত্বর ... মানুষের পঞ্চাশ হাজার বছরের আহরিত সভ্যতাবোধের ... প্রতি, নিজের প্রতি, পরিবার গোষ্ঠী স্ত্রী বোন মা ছেলে ... প্রতি, প্রেয়সীর প্রতি, যা'র সামান্যতম বেদনাবোধ আর দরদ ... ও যে সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটিয়া দালাল নয়, পৃথিবীর ঘনা... য়েছে, অধুনাতম এই দুর্যোগকে পরাহত করবার উদ্দেশ্যে সে নিজের শক্তিসঞ্চয় করে' না দাঁড়িয়ে পারে না। প্রতি দেশে নানান্ রূপে সাম্রাজ্যবাদ দেখা দিয়েছে, পৃথিবীর আধুনিক ...লের ইতিহাস এই অলিখিত সত্যটিকেই ঘোষণা করছে।

'অগ্রগতি'র আগামী সংখ্যাই "গ্রীষ্ম-সংখ্যা"
২৭শে বৈশাখ প্রকাশিত হবে।

সম্পাদকের দেরাজ

পূর্বেকার এক সংখ্যায় লিখেছিলাম যে কংগ্রেস সত্যি সত্যিই জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন করতে পারে না, বিলোপ সাধন সে চায়ও না। এবং এ-কথাও লিখেছিলাম যে যদি কেউ জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করে, কংগ্রেস তা'কে ছেড়ে কথা কইবে না।

'হরিজন' নামে একটা কাগজ আছে গান্ধীজির। কল্‌কাতায় অবস্থান কালে এখানকার কতিপয় উগ্রপন্থী সমাজ-সেবীদের প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজি জমিদারী প্রথা সম্পর্কে যে সব কথা বলেছেন, এই কাগজটায় তা'র বিবরণ বেরিয়েছে।

এখানকার দৈনিক কাগজে তা'র পুনর্মুদ্রন পড়ে' আমার আগেকার কথাই আবার বল্‌তে হলো: গান্ধী হচ্ছে ভারতীয় উচ্চমধ্যবিত্ত-শ্রেণীর এবং অভিজাত-শ্রেণীর দালাল। এ-দেশের [illegible]ক্ত এই দুই সম্প্রদায়ের সঙ্গে বস্তুত ব্রিটিশ অভিজাত ও [illegible]চ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোনো সত্যিকার বিরোধ নেই; উদ্দেশ্য [illegible]ম্পর্কে এরা একই ভাবে জনসাধারণকে শোষণ করে' থাকে। [illegible]তীয় জাতীয় কংগ্রেস' হচ্ছে ভারতীয় বুর্জোয়াদের প্রতিষ্ঠান, [illegible]ন্ধী এবং তা'র অনুচররা এর পরিচালক এবং রক্ষাকর্তা। [illegible]বদেশী বুর্জোয়াদের সঙ্গে দর কষাকষি করবার 'এক্সচেঞ্জ আফিস' হচ্ছে এই কংগ্রেস। এরা জনসাধারণকে বুজ্‌রুগী এবং [illegible] দিয়ে নিজেদের প্রভুত্ব কায়েমী করে' রাখে। জনগণের [illegible]কার উন্নতি এদের কাম্য হ'তে পারে না।

[illegible]তরাং, জমির অধিকার চাষীর বলে' মুখে স্বীকার করে' [illegible]ই যখন গান্ধীজি বল্‌লেন, 'তাতেই বলা যায় না যে [illegible]রদিগকে উচ্ছেদ করতে হ'বে'—তখন গান্ধীবাদ তথা [illegible]গ্রেসের মূল রহস্যটি পরিষ্কার হয়ে দেখা দিল।

'নাম জপ করিব কিন্তু সিঁধ কাটিতে ছাড়িব না'—কংগ্রেসের গণ-প্রীতি সর্ব্বাংশে কি এই রকমটিই নয়?—অন্তত গান্ধী ও বল্লভভাই রাজাগোপাল প্রমুখ সাকরেদরা যতদিন অবধি কংগ্রেসের মোড়ল থাকবে, তত দিন অবধি কংগ্রেসকে কোনো সুস্থ মস্তিষ্কবান ব্যক্তিই প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান বল্‌তে পারবে না।

জমির প্রকৃত মালিক যদি চাষীরাই হয়, এবং জিলায় যদি কালেক্টর ডিপুটি কালেক্টর ও তহশিলদাররা থাকে, তা' হ'লে জমিদাররা কোন্ অপার্থিব শোভাবর্ধনের নিমিত্ত বিরাজ কর্‌বেন? জমিদার ও মিল-মালিকদের পোষ্য পুত্র তিনি, তা'দেরই পক্ষপুটে তিনি এতকাল মানুষ হয়েছেন, নিমকহারামী তিনি কর্‌বেন কিরূপে? সুতরাং চাপে পড়ে' জমিদারী প্রথার সংশোধন চাইলেও আমূল পরিবর্তন তিনি চাইতে পারেন না।

তিনি বলেছেন, 'সমস্ত জীবন আমি কিষাণ ও শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করেছি।' গান্ধীবাদের অভিধানে কিষাণ-শ্রেণী প্যাটেল-গোপাল শ্রেণীরই নামান্তর এবং শ্রমিকের মানে থ্যাকা-রসে-বির্‌লাই তিনি বোঝেন। আমেদাবাদে শ্রমিক-মালিক বিরোধের সালিসী-বোর্ড গঠনে তাঁ'র তৎপরতা এবং বিহারে কিষাণ-আন্দোলন প্রশমার্থে তাঁ'র শিষ্যদের ব্যস্ততা প্রণিধান কর্‌বার পর নিশ্চিন্তেই বলা চলে যে লর্ড লিন্‌লিথ্‌গোর মতোই তিনি এ-দেশের চাষী-মজুরদের দরদী।

বিগত মহাযুদ্ধে ভারতীয় জমিদার ও সামন্ত রাজারা অন্যূন দেড়শত কোটি টাকা ব্রিটেনকে সাহায্য দিয়েছিল। জমিদারী প্রথার পত্তনের মূলে ব্রিটিশ রাষ্ট্র ধুরন্ধরদের মনে এই আপৎকালে সাহায্যপ্রাপ্তির প্রত্যাশাই বলবতী ছিল। সিপাহীবিদ্রোহে জমিদাররাই ইংরেজ শাসকদের সাহায্যে নেমেছিল। ব্রিটিশ রাজনীতি প্রত্যেক কলোনিতেই আত্ম-সর্ব্বস্ব প্রভুভক্ত একটি প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী সৃষ্টি কর্‌বার পক্ষপাতী। ভারতীয় জমিদাররা সেই শ্রেণী। গান্ধীজি এদের রক্ষাকামী। কংগ্রেস গান্ধীজির 'লাউড্ স্পীকার'। সেই 'লাউড্ স্পীকার' কোনো উগ্রপন্থী বা প্রগতিপন্থীরা দখল করে, গান্ধীজি ও তা'র অনুচররা তা' চান না। বিগত হরিপুরা কংগ্রেসে বল্লভভাই প্যাটেলের প্রগতিপন্থীদের বিরুদ্ধে হুঙ্কার, মাদ্রাজে সমাজ-তন্ত্রীদের শাস্তিপ্রদান, উড়িষ্যায় জমিদারদের আশ্বাস প্রদান, গান্ধী সেবাসঙ্ঘ কর্তৃক কংগ্রেসে যোগদান,এবং সর্বোপরি কিষাণ সভা সমূহের পরিচালকদের ফ্যাসিস্ট্ বলে' গাল দেওয়া,··· এ সব মিলে কি প্রমাণ করে?

প্রমাণ আর যাই করুক না কেন, অন্তত এটা প্রমান করে না যে কংগ্রেসের বর্তমান পরিচালনা যা'দের করায়ত্ত, তা'রা বুর্জোয়াদের দালাল ছাড়া আর কিছু।

—নি

অদ্ভুত

আশু চট্টোপাধ্যায়

সকালবেলা চিঠি পেলাম—'বিশেষ কাজের জন্যে আমাকে বাইরে চলে' আসতে হয়েছে। দিন দুয়েক পরেই কলকাতায় ফিরে দেখা করব।' দুপুরে শুনলাম, নারীহরণ অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সন্ধ্যেবেলায় একজন এসে বললে, "অমলের খবর জান?"

বললাম, "জানি, সে বিশেষ কাজের জন্যে বাইরে·· ···"

সে বললে, "এই মাত্র তাকে নিমতলায় পুড়িয়ে এলাম।"

আকাশ থেকে মাটীতে আছ্‌ড়ে পড়ে' বললাম, "সে কি! কি হয়েছিল?"

"ডাব্‌ল্ নিমোনিয়া, দুটো ফুস্‌ফুসই একেবারে···"

বাইরেই বা গেল কখন, গ্রেপ্তারই বা হল কখন, নিমোনিয়াই বা হল কি করে'! মৃত্যু-সংবাদটা ঠিক বিশ্বাস করিনি। অমলের সম্বন্ধে অনেক গুজব রটে। তাই এরপর অনেক দুপুরে সদর দরজার কড়ার দিকে কাণ পেতে রেখেছিলাম। মনে একটা বিশ্বাস ছিল, যে-কোনো দিন সেটা অস্বাভাবিক ক্ষীপ্রতায় বেজে উঠবে এবং অমল বাইরের ঘরের ফরাসের ওপর গা ঢেলে দিয়ে তার সেই ঝক্‌ঝকে গলায় বলে' উঠবে. "এক গ্লাস জলের অর্ডার দাও দিকি। তারপর তোমায় ইণ্ডো-চীনের গল্প শোনাচ্ছি। এই মাত্র সেখান থেকে এলাম।"

ঝপ্ করে' মাঝে ইণ্ডোচীন ঘুরে আসাও তার পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু তার পক্ষে নারীহরণের মামলায় জড়িয়ে পড়া সত্যিই বিশ্বাসের বাইরে। আর যাই হোক্ আত্ম-সম্ভ্রম বোধ ওর টন্‌টনে ছিল। আর তাছাড়া, নারীহরণের ওর দরকার ছিল না। অনেক বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে ও আমায় নিজে দেখিয়েছে দোতলার ঘরে কোনো না কোনো মেয়ে ওর ওপর তাক্ করে' জানলার ধারে ঘুরঘুর করে' বেড়াচ্ছে।

ওর দীর্ঘ ঋজু চেহারা, সুগঠিত মুখ, সর্ব্বাবয়বে যৌবন ও পৌরুষের নির্জ্জলা অভিব্যক্তি ওর প্রতি সকলের মন আকৃষ্ট করত। বেশীক্ষণ ওর চোখের দিকে চেয়ে থাকা যেত না। মনে হত, ওর চোখটা যেন তরল—তরল আগুন। সাধারণ পোষমানা জীবনের ওপর ও ছিল ভীষণ খাপ্পা আর অতি সাধারণ লোকদের সে সহ্য করতে পারত না। টাকা তার ছিল তবু বেশীর ভাগ সময় সে একটা ছেঁড়া ময়লা জামা পরে' থাকত. তাতে লেগে থাকত খানিকটা কালির ছোপ, পায়ে একটা ছেঁড়া স্যাণ্ডাল। মুখে একমুখ দাড়ি। মাথার চুলগুলো এলোমেলো। প্রায় সব সময় হাতে থাকত অজস্র বই—যতগুলো বই সে বয়ে' নিয়ে বেড়াতে পারে। তার মধ্যে বেশীর ভাগ বই আনাতোল্ ফ্রাসের। টেব্‌লের উপর সশব্দে সেগুলোকে ছুড়ে' দিয়ে চেয়ারে বসে পাদুটোকে টেব্‌লে তুলে দিয়ে আমাদের বলত, "পড়াশুনা ত করবে না, তাহলে দেখতে এদের মাথায় কতটা মগজ ছিল। তোমরা যদি বা পড়, পড়বে ওই রবিঠাকুরের লেখা—যত সব ন্যাকামার্কা, প্যান্‌পেনে পচা মাল!"

কথাটা হ'ত ঠাকুর-বাড়ীরই কোনো একটি কবিযশোপ্রার্থী তরুণ বংশধরের ঘরে বসে'। এই তরুণ বংশধরটির ছিল লিক্‌লিকে স্লিম্ চেহারা, পরণে ঠাকুর-বাড়ীর পায়জামা আর গেরুয়া জোব্বা, কণ্ঠস্বরটি মিঠে ও মিহি। কথা হচ্ছিল একটা পত্রিকা বের করবার। অমল বলেছিল, "তোমায় বাপু এই স[illegible] ঢঙ্ ছাড়তে হবে। ওসব রবিঠাকুরী পোজ্ আমার কাছে চলবে না।" আর আমার দিকে চেয়ে বলেছিল, "তোমার এলেম্ আছে, কিন্তু বুদ্ধিটাতে আরও একটু ধার দিতে হবে।"

কিন্তু তবু আমরা তিন জনে পরস্পরকে পছন্দ করতাম। কোথায় যেন তিনজনের মধ্যে একটা মিল ছিল। অমল লিখত হ্যাঁ, অমলও লিখত। কিন্তু সে লেখা বাঙলা দেশের আবহাওয়ায় এমনি বেখাপ্পা যে, কোনো পত্রিকার সম্পাদক তা দেখলে, আমার মনে হয়, রাত্রি তাঁর অনিদ্রায় কাটত। কথাগুলো যেন মেসিন-গান্ থেকে কট্‌কট্ করে' বেরিয়ে আসছে। সৌভাগ্যের কথা এই যে অমল বেশীর ভাগ সময়ই লেখার পর সেগুলোকে ছিঁড়ে ফেলত। "নাঃ, এটা নোবেল্ প্রাইজ পাবার উপযুক্ত হয়নি। তাহলে আর এটাকে রেখে কি হবে!" আমি জানি, একবার সারারাত জেগে একটা ছোট উপন্যাস শেষ করে' সকালে সেটাকে ছিঁড়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল। দু-একটা লেখা আমরা তার কাছ থেকে কৌশলে সরিয়ে রেখে জোর করে' কোনো পত্রিকায় ছাপিয়াছিলাম। একটা গল্পের গোড়ার লাইনটা মনে আছে; "ওহে শুনেছ, মেটারলিঙ্কের নীলপাখি ধরা পড়েছে!" বেচারা বাঙ্গালী পাঠক! সে নীল পাখীর কোন খবর রাখে! সেটা ধরা পড়ুক আর নাই পড়ুক. তাতে কার কি যায় আসে!

হাঁ, একবার সে নিজে একটি পত্রিকায় তার লেখা ছাপিয়েছিল। ছাপিয়েছিল শুধু সেই ছাপাবার মজাটি উপভোগ করবার জন্যে। সেই মজাটি কি রকম শুনুন। কগজটি সেই সময় চলছিল ভাল, মাসিকপত্র, তিন তিনজনা সম্পাদক। আগে যে ঘরে 'ভারতী'র অফিস ছিল সেই ঘরে তাদেরও অফিস। তিনজন সম্পাদক ছাড়া আরও অনেক সাহিত্যিকের সন্ধ্যাবেলা সমাগম হ'ত। সাহিত্যের আলোচনাত একটা আকর্ষণ বটেই তাছাড়া সামনে ও আশেপাশে বারান্দায় নাকি আরও আকর্ষণ ছিল।

দোতলার এই অফিস-ঘরটিতে একদিন আবির্ভাব হল অমলের। সম্পাদকদের দুজনের সঙ্গে তার চেনা ছিল। একজনকে সে বললে, স্রেফ্ বলে' গেল, "ওহে, তোমাদের কাগজের এ সংখ্যায় আমার এই লেখাটা যাচ্ছে।"

এখন, সম্পাদকটি একটু নিরীহ গোছের। চিরাচরিত প্রথায় বলতে গেল, "এবার জায়গা হবে কিনা জানি না। আর তাছাড়া সব ছাপাও বোধ হয় এতক্ষণ শেষ হয়ে এল..."

"সে বিষয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। আমি নিজে প্রেসে গিয়ে খবর নিচ্ছি।" প্রেস নীচে। সে তরতর করে' চলে গেল। খানিক পরে ফিরে এসে বললে, "জায়গা প্রচুর। ওরা লেখার জন্যে বসেছিল। দিয়ে এলাম। কম্পোজ করছে। প্রুফটা কাল এসে দেখে দিয়ে যাব।"

তারপর চেয়ারে বসে' সেই চিরাচরিত প্রথায় পা দুটোকে টেবলে তুলে দিয়ে বললে, "তারপর, খবর কি? বাঙলা দেশের গোবেচারী পাঠকদের ঘাড় ভাঙছ কেমন!"

ভালমানুষ সম্পাদকটি জানত না, এই সব কথার উত্তরই বা দেওয়া যায় কেমন করে,' অমলকে সামলানোই বা যায় কি উপায়ে। এরপর অমল সম্পাদক বলতে কি বোঝায় তার ওপর একটা লেকচার দিল "সম্পাদক হচ্ছেন তিনিই যাঁর একটি ভাল পার্কার ফাউন্টেন পেন আছে, সৃষ্টির সময় অন্যমনস্ক হয়ে বিধাতা যাঁর মাথায় বুদ্ধি দিতে ভুলে গেছলেন, সারাদিন গাম্ভীর্য্যের মুখোস পরে' চেয়ারে বসে' বসে' খবর্দারী করাই যাঁর কাজের চূড়ান্ত, ভালো করে' কারুর সঙ্গে দুটো কথা বললে যাঁর মর্য্যাদা-হানি হয় এবং সেই রকম কথা বলবার যাঁর ক্ষমতাও থাকে না, লেখা বোঝবার ক্ষমতা ত দূরের কথা—ইত্যাদি, ইত্যাদি।" তার ভাব দেখে মনে হ'লনা যে, ঘরে যে আরও লোক আছে সে-কথা সে মনে রেখেছে।

এরপরই একটি লেখক ঘরে ঢুকলেন 'যুদ্ধং দেহি' ভাব নিয়ে। তার একটি লেখা নাকি বরখাস্ত হয়েছে। অথচ তাঁর ধারনা তিনি এত বড় নাম-করা লেখক যে তাঁর লেখা নাকচ্ হ'তে পারে না। তিনি কোনো চেয়ার গ্রহণ না করে' ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গর্জ্জন সুরু করলেন।

অমল পাদুটোকে না নামিয়েই বললে, "এদিকে আসুন কথাটা শুনি। কি হয়েছে।"

ভদ্রলোক একটু ভড়কে গিয়ে তাঁর বক্তব্য বললেন।

অমল বেশ ভদ্র ভাবে জিজ্ঞেস করলে, "লেখাটি কোথা থেকে চুরি করেছেন।"

ক্রোধে ভদ্রলোকের বাক্‌রোধ হ'ল। তিনি কক্ষ ত্যাগ করলেন। শুধু যাবার সময় শাসিয়ে গেলেন যে এর প্রতিকার তিনি করবেনই।

অমল সম্পাদককে হাসিমুখে বললে, "আজ ত' উদ্ধার পেলে। কিন্তু সাবধানে থেক। যা লোকটির গুণ্ডাগোছের চেহারা!"

আপনাদের জানানো দরকার বোধ করছি যে পত্রিকাটির পরবর্ত্তী সংখ্যার সম্পাদনা করল অমল এবং তারপরই সেটি উঠে গেল। সম্পাদনার ফলেই উঠল কিনা তা জানি না। তবে তার কথাবার্ত্তা ও চালচলনের মত তার সম্পাদনা হজম করাও শক্ত।

পরে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "পত্রিকাটির ঘাড়ে চাপতে গেছলে কেন?"

বলেছিল, "দুটি সম্পাদক একেবারে গবেট। তাদের অমন যথেচ্ছ বিচরণের অধিকার নেই।"

"তাই বলে' তুমি খাপ্পা হয়ে একটা কাগজ তুলে দেবে! পৃথিবীটাকে একদিনে শুধ্‌রে দিতে পার না। ক্ষতিই করা হয় শুধু।"

"ক্ষতি হয় কি না জানি না। ওই লোকগুলোকে আমি কিছুতেই সইতে পারি না। আর আসলে খাপ্পা আমি কারুর ওপর হই না। আমি যার ওপর খাপ্পা হব তার আর রক্ষে নেই।" একটু থেমে সে উত্তর দিয়েছিল!

কথাটা সত্যি। খাপ্পা সে এক জনের ওপর হয়েছিল। লোকটি তখন কাব্য-জগতে বিশেষ নাম করেছিল। নাম সুশোভন হালদার। শান্তিনিকেতনের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র। টাকা ছিল কিন্তু বাড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করে' বেরিয়ে এসেছিল, এখানে সেখানে থাকত, বাব্‌রি চুল ছিল, বকাটে ছোকরা; নর্দ্দমা, কাদা প্রভৃতির ওপর বেশ জোরাল কবিতা লিখত এবং তারপর সকলকে ধরে' ধরে' সেগুলো শোনাত এবং তখনকার শ্রেষ্ঠ আধুনিক কাগজগুলোতে সেগুলো ছাপা হ'ত। লোকটির মনটা আসলে ভালই ছিল।

কিন্তু কি জানি কোন অশুভ মুহূর্ত্তে অমলের বিরুদ্ধে কি

এমন একটা অপরাধ ক'রে ফেলেছিল যাতে নাকি তার আত্ম-সম্মানে অসম্ভব রকম আঘাত লেগেছিল শুনলাম এর জন্যে অমল নাকি তাকে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে দাঁড় করিয়ে চাবুক মেরে রক্তাক্ত করে' ছেড়ে দিয়েছে! লোকটা যে মারা যায়নি তার কারণ পাঁচ জন এসে বাধা দিয়েছিল।

চার পাঁচ দিন অমলের দেখা নেই, ভেবেছিলাম হয়ত পুলিশের হাত এড়িয়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ একদিন বিকেলে এসে উপস্থিত। চেহারায় চেক্‌নাই ভাব। তাকে যেন চেনবার উপায় নেই।

বললাম, "কি কাণ্ড করে' বেড়াচ্ছ বল ত! তোমার জন্যে আমরাও কি লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারব না? রাস্তায় মারামারি করলে কি ব'লে!" তারপর তার গলা আর হাতের দিকে চেয়ে বলে' উঠলাম, "ওকি, ওসব দাগ কিসের! তুমিও কি রাস্তার লোকের কাছে মার খেয়েছিলে নাকি? খেয়ে থাক ত বেশ হয়েছে!"

কিছুক্ষণ মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললে, "আমায় কে মারবে! যাক, সেই উল্লুকটার কথা থাক, ও সব দাগের কথা থাক। আনাতোলের কখানা বই তোমার কাছে আছে? আর আপ্‌টন্ সিন্‌ক্লেয়ারের?"

"কেন?" জিজ্ঞেস করলাম।

"আমার বোন একটা লাইব্রেরি খুলেছে, সেখানে দিতে হবে।"

"আচ্ছা সে হবে এখন," বললাম, "এখন বল ও-দাগ কিসের?"

"পাচিল ডিঙুতে গিয়ে ছড়ে' গেছে।" সে বেশ শান্ত গলায় বললে।

"পাচিল ডিঙুতে গিয়ে!" কথাগুলো কোনোরকমে গলা দিয়ে বের হয়ে এল। অমল অন্ধকারে চোরের মত পাচিল ডিঙিয়ে পালাচ্ছে এ-দৃশ্য কল্পনাও করতে পারি না। "পুলিশে তাড়া করেছিল?" জিজ্ঞেস করলাম।

কিছুক্ষণ সে শিস্ দিতে দিতে ঘরের মধ্যে পায়চারি করল। এই নতুন ভাব-ভঙ্গী দেখে আমি অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম। হঠাৎ সে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে চোখের দিকে চেয়ে বললে, "কেন, আমার কি প্রেম করতে নেই! ওটা কি তোমাদেরই একচেটে?"

কোনো রকমে হাসি চেপে বললাম. "কে সে কথা বলছে! কিন্তু তার জন্যে পাচিল ডিঙুতে হবে? সেই ভাগ্যবতীটি কে? কোথায় থাকে?"

চেয়ারটায় বসে' বললে, "ভারী পটে' গেছে' হে, আর বেড়ে জিনিষ। কিন্তু মুস্কিল ওই। পাচিলের মধ্যে থাকে। বাপ মা ভারী কড়া ধরণের। তবে মেয়েটিও গেছো। কাল ত আমার সঙ্গে সেও পাচিল টপ্‌কে বেড়াতে গেছল। তাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে গিয়েই ত বিপদে পড়লাম।"

"বাপ টের পেয়েছিল বুঝি?" জিজ্ঞেস করলাম।

"এবং তাড়া করেছিল।" সে হাসতে হাসতে বললে।

বললাম, "জুটেছে ভাল। কিন্তু জায়গাটা কোথায়?"

"কলকাতার বাইরে। খুব বেশী দূরে অবশ্য নয়। যাও ত দেখাতে পারি।"

"দরকার নেই।" বললাম, "মারধোর সইবে না। যাক্ এখন করবে কি?"

"তাই ত ভাবছি। বই ক'টা এনে দাও, আপাততঃ যাওয়া যাক্।" সে ফরাসে শুয়ে পড়ে' বললে।

এরপর সাতদিন তার কোনো পাত্তা নেই। তার নিজের অজস্র বই পুরনো বই-এর দোকানে দেখতে পেলাম। আমার বই-ক'খানারও ওই দশা হয়েছে কিনা বুঝতে পারলাম না। তবে এটুকু বুঝতে পারলাম যে কোনো কিছুর জন্যে তার হঠাৎ টাকার দরকার হয়েছিল এবং হাতে তা ছিলনা।

উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। ভাবলাম কোন দুরভিসন্ধি মগজে ভর করেছে কে জানে! সাহায্য সে কারুর কাছ থেকেই হাত পেতে নেবেনা তা জানতাম। চুপ করে' বসে' থাকা ছাড়া উপায় ছিল না।

তারপরই পেলাম ওই চিঠি এবং ওই খবর দু'টি। শেষের খবরটিতে আজও আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারিনি। মনে হয় ওটা অমলের গা-ঢাকা দেওয়ার একটা কৌশল মাত্র। যে-কোনোদিন সে এসে সদর দরজার কড়াটা সজোরে নাড়তে পারে এবং তারপর চেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে বলতে পারে, "একগ্লাস জলের অর্ডার দাও ত আগে, তারপর বলছি......"

চলতি

গীতসুন্দর দিলীপকুমার (গীতসুন্দর—গীতশাস্ত্রে সুন্দর জ্ঞান যাঁ'র তিনি,) সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে, ভদ্রলোক এদেশে বসে' ইয়োরোপীয় (!) সুরে ভারতীয় গান গেয়ে থাকেন, এবং ইয়োরোপে বসে' ভারতীয় (!) সুরে ইংরেজী গান গেয়ে থাকেন। ফলে, ভদ্রলোকের প্রতিপত্তি যাহোক্ বজায় থাকে।

বিদ্যাসুন্দর ধূর্জ্জটিপ্রসাদ (বিদ্যাসুন্দর—বিদ্যাশাস্ত্রে সুন্দর জ্ঞান যাঁ'র তিনি,) সম্বন্ধে সবাই জান্‌তো যে, ভদ্রলোক এঁড়ে গরু থেকে আইন্‌স্টাইন্ অবধি কোনো বিষয়কেই কি লেখা কি বক্তৃতা কোথায়ও উপেক্ষা করেন না।

...এহেন যুগ্মপ্রতিভা—গীতসুন্দর এবং বিদ্যাসুন্দর, ম্যাডান থিয়েটার মঞ্চে অনুষ্ঠিত সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা-প্রদর্শনীতে পশ্চিম ভারতীয় গায়িকা কেশর্‌বাঈ-এর ভজন গানে নাকি আউন্স্ কয়েক গজলের গাঁজ্‌লা মিশ্রিত আছে, এরকমটা বলে' ফেলেছিলেন। এদেশে বসেই ভারতীয় সুর সম্বন্ধে ওস্তাদী করবার ধৃষ্টতা দিলীপকুমারের হোলো যে কেন, আর সর্ব্ববিদ্যা-পারদর্শী ধূর্জ্জটিপ্রসাদই যে কেন তা'তে সায় দিলেন, তা' মনস্তত্ত্ববিদ্‌দেরই বিচার্য্য।

কিন্তু কেশর্‌বাঈ-এর এ ভাই ভারী অন্যায়! ভালো গাইতে পারেন বলেই আর স্ত্রীলোক বলেই যে তিনি এই যুগল সুন্দর-সবজান্তাদের নাক মলে' দেবেন,—তিনি একমাত্র স্ত্রীলোক ব'লেই আমরা এ অপমান সহ্য করলাম। হোতো আর কেউ, দেখে নিতুম একবার! দু'দুখানা কড়্‌কড়ে বিবৃতি ঝেড়ে' দিতুম এদ্দিনে।

* * * *

বিবৃতি সম্পর্কে কোনো কথা উঠ্‌লেই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে বিবৃতি-বিশারদ রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের কথা। নির্ব্বিবাদ বিবৃতি নিয়ে এতকাল কোনো ঠ্যালা তাঁকে পোয়াতে হয়নি; কিন্তু এবারকার মেয়রালী সম্বন্ধে তাঁ'র নিবেদন-বিবৃতি পাঠ করে' আমরা রীতিমত চিন্তান্বিত হ'য়ে পড়েছি। দোহাই তোমাদের, নিশীথ সেনের অনুরাগী অন্যান্য কংগ্রেসী কৌন্সিলররা, দুলালের মুখ রক্ষা করো। এবার যদি দুলাল আবার এরোপ্লেন চেপে পড়ে, তা' হ'লে শুধু ভিয়েনায় শানা'বে না, হয়তো...থাক্ সে কথা। নিদেন পক্ষে বাপুজীই হয়তো ছুটে আস্‌বেন।

* * * *

সিনেমা এবং সিনেমা-পত্রিকা-ওয়ালাদের বাণীবিন্যাসের ঠ্যালায় বীণাপাণি একেবারে ব্রহ্মার দরবার অভিমুখে পালাবার উপক্রম করেছেন। থিয়েটার-ওয়ালাদের পাল্লায় পড়ে দান—'অবদান' হয়েছিলো বহুকাল আগেই। কিন্তু হালে যা' সব নমুনা দেখ্‌ছি তা' তো সাঙ্ঘাতিক: "চিঙ্কাহ্রদের কৈ মাছের প্রতিবাদ" ('দীপালি' ১৪ই এপ্রিল)। "যে পুরুষকে সে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল সেই জন ·" (সিনেমার বিজ্ঞাপন)।

শব্দ যে ব্রহ্ম তা' এতদিনে হাড়ে হাড়ে অনুভব করছি।

* * * *

'অপ্রিয় হইলে সত্যও বলিবে না'—এই মহাজন বাক্যই যে বহুতর মনস্তাপ না-ঘট্‌বার ফর্ম্মুলা হিসেবে প্রয়োগ করা হয়েছে, তা' অবিশ্বাস করবার সঙ্গত কোনো কারণ নেই। বৈশাখ সংখ্যা শনিবারের চিঠির সম্পাদকীয় কবিতায় আমরা একটি অপ্রিয় সত্যের নমুনা দেখে মর্ম্মাহত হয়েছি। সজনীকান্ত হাতী বাঘ বা গাধা নহেন, যদি তিনি তা' হ'তেন তা' হ'লে বিষ্ণুশর্ম্মার কাহিনীর পুনরুল্লেখ করে' সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করা যেত। কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই জন্তু নহেন, সুতরাং আশ্বাস দেবারও কিছু নেই আমাদের।

তিনি স্বীকার করেছেন:

"মনে পড়ে একদিন বাজায়ে ছন্দের বীণ্
লিখিয়াছি কাহন কাহন!
গেছে বিত্ত আছে নাম, অসহায় পরিণাম—
দুই আঁখি উঠে ছলছলি।"

একটি হাঙ্গেরীয়ান প্রবাদ আছে যে মুরগীর ডাক ঘড়ির চেয়েও বেশি সত্য বলে। প্রবাদ-বাক্যটি যিনি রচনা করেছিলেন, তাঁ'র ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি ছিল বল্‌তে হ'বে।

* * * *

শিল্প-সমালোচনার ক্ষেত্রেও যে হেমেন রায় একটি উজ্‌বুক্, কা'র সাধ্য আছে তা' অস্বীকার করবে! ২১ এপ্রিল তারিখের দীপালিতে তিনি লিখেছেন, "ভারতীয় শিল্পীরা...শত শত জীবজন্তুর মূর্ত্তি ফুটিয়ে তুলেছে। এই সব বিরাট ভাস্কর্য্যের নিদর্শন আজও অজন্তা প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়।"

পাণ্ডিত্য এবং পণ্ডিতম্মন্যতা যে একবস্তু নয়,—একথা অনেকেই জানে না; তা' তা'র বয়স বাহান্নই হোক্ আর বাহাত্তরই হোক্।

—ঘানি

রাত্রি খুব ছোট মনে হয়

আশু চট্টোপাধ্যায়

রাত্রি খুব ছোট মনে হয়,
মনে হয়
মুঠোয় ধরিতে পারি আকাশের সব তারাগুলো
সমস্ত আঁধার যেন তোমার সুগন্ধ ওই এলো খোপাখানি
আমার আঙুল যেন খেলা করে তার মাঝে মুহূর্ত্তের
কাঁটাগুলো নিয়ে।

রাত্রি খুব ছোট মনে হয়।
মনে হয়
চোখের তারার তব তার চেয়ে অনেক বিস্তৃতি,
তোমার এ চেয়ে-থাকা সময়ের সীমান্ত উত্তরি'
কাঁপিবে আমার চক্ষে শত জন্ম জন্মান্তর দ্যুতিমান
অসহ পুলকে।
তোমার চকিত স্পর্শ ওই দেখ কাঁপিছে আকাশে
শত শত নক্ষত্রের আলোয় আলোয় আলিঙ্গনে
নিভৃত ইঙ্গিৎময়।

যদি নিচু হয়ে
দিই তব দুটি ঠোঁটে আগুনের রোমাঞ্চ বুলায়ে
অমনি চঞ্চল হবে তরুশিরে রাত্রির বাতাস,
তপ্ত স্বাদে শিহরিবে ঘুমন্ত প্রিয়ের পাশে নিদ্রাহারা সহস্র রমণী
সঞ্চারিত মিলন রভসে।

রাত্রি খুব ছোট মনে হয়,
মনে হয়
তোমার দেহের মাঝে তার চেয়ে রহস্য অনেক।
অচুম্বিত ক্ষণগুলি তৃষাতুর চাহে ওষ্ঠ পানে,
আলিঙ্গন-ঔৎসুক্যের প্রেত-মূর্ত্তি ঘুরে মরে কুণ্ঠা-দীন
না-বলা কথায়;—
রাত্রি খুব ছোট মনে হয়,

ভারতে মনঃ-সমীক্ষা

রবি ঘোষ

বৈজ্ঞানিক সভা (Science Congress)—১৯২৫ সালে প্রথম মনোবিদ্যা পৃথক বিজ্ঞান বলে' স্থান পেল এবং সেখানে মনোবিদ্যার সম্পর্কে মনঃ-সমীক্ষার আলোচনা হ'য়ে থাকে। ১৯৩৩ সালে মনোবিদ্যা-শাখার সভাপতি ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু A new theory of mental life নামে অভিভাষণ পাঠ করেন। উক্ত বক্তৃতায় তিনি মনঃ-সমীক্ষা সম্বন্ধে নিজের মত ও জ্ঞান ব্যক্ত করেছেন।

১৯৩১ সাল থেকে ভারতীয় যাদুঘরে বাৎসরিক স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীতে মানসিক স্বাস্থ্য (Mental Hygiene) শাখা খোলা হয়। সেখানে মনঃ-সমীক্ষার জ্ঞান মনোবিদ্যার পাশাপাশি, ছবি ও বিজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করবার চেষ্টা হয়ে আসছে। মানসিক ব্যাধির কারণ নির্ণয়ে এবং আরোগ-লাভে মনঃ-সমীক্ষা সাহায্য করতে পারে, সাধারণের কাছে সে-কথাগুলি বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। ডাঃ বসু, তাঁর সহকর্মী ও ছাত্রদের সহায়তায় এই প্রদর্শনীর কাজ করে' থাকেন। মনঃ-সমীক্ষার জ্ঞান মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে তা' বোঝাবার জন্য সচিত্র বক্তৃতা দেওয়া হয় এবং আজ পর্য্যন্ত দুইখানি [illegible]ও মুদ্রিত হয়েছে।

মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা করবার এবং সভ্যগণের মধ্যে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে একটী (Mental Hygiene) 'মানসিক স্বাস্থ্য সমিতি'র শাখা সমিতি আছে। ভারতীয় মানসিক স্বাস্থ্য সমিতি Indian Association for Mental Hygiene নামে অভিহিত এই সমিতির অধিবেশনে ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় শিক্ষিত নরনারীর সমাগম হয়। প্রতি মাসের একটী দিনে এই সমিতির সভার অনুষ্ঠান হয়। সেখানে ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু, শ্রীহরিপদ মাইতি, বার্কলে হিল্, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ পণ্ডিত মনবিজ্ঞানিকগণের দ্বারা বক্তৃতার অনুষ্ঠান হয়। সর্ব্বসাধারণের যে কোন শিক্ষিত নরনারী ঐ সভায় যোগদান করতে পারেন, এবং বক্তার উক্তিকে উপলব্ধি এবং বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মনের সন্দেহ দূর করবার জন্য প্রশ্নাদি করতে পারেন। এই সমিতি ভারতে য়ুরোপীয়গণের দ্বারা প্রথম অনুষ্ঠিত হ'লেও কলিকাতা শাখা সমিতি ভারতীয় সমীক্ষকগণের দ্বারা পরিচালিত। সমীক্ষক শ্রীহরিপদ মাইতি উক্ত সমিতির সম্পাদকের কাজ করে' মনঃ-সমীক্ষার জ্ঞানকে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচার এবং ব্যবহারযোগ্যভাবে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

যাতে মন-বিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সুবিধা-জনক হয় সেজন্যে ১৯৩৩ সালের ১লা মে বেলগাছিয়া কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে একটী psychological clinic খোলা হয়। ডাঃ বসু এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। তিনি নিজে উপস্থিত থেকে প্রতি মঙ্গল এবং বৃহস্পতিবার সকালে রোগীদের ব্যবস্থা করে' থাকেন। ঐ দু'দিন প্রাতে ৮টা থেকে ১০টা পর্য্যন্ত দুই ঘণ্টাকাল নিয়মিতভাবে রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। রোগের নিরাময়তায় যদি মনঃ-সমীক্ষার প্রয়োজন হয় তবে সে উপদেশ দেওয়া হয়। অন্যান্য চিকিৎসা-বিধির মত সমীক্ষণ outdoor-এ ব্যবহৃত হওয়া সম্ভব নয়। তবু সমীক্ষণ-বিদ্যার সাহায্য নিয়ে তাদের রোগের কারণ নির্ণয় করা হয় এবং যতদূর সম্ভব উক্ত বিদ্যার সাহায্য দেওয়া হয়।

মনঃ-সমীক্ষার সম্বন্ধে শিক্ষিত সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ভারতীয় সমীক্ষকেরা অন্য দুইটী প্রথা অবলম্বন করে' থাকেন। সর্ব্বসাধারণের জন্যে বক্তৃতামঞ্চে বক্তৃতা করে' মনঃ-সমীক্ষার জ্ঞানকে তাদের কাছে সহজলভ্য করে' তোলবার চেষ্টা করেন। ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু, শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র প্রমুখ পণ্ডিতগণ সেই উদ্দেশ্যে বহুস্থানে বক্তৃতা করেছেন। যে-সব পত্রিকা সাধারণের কাছে সুলভ সে-গুলিতে প্রবন্ধ লিখে মনঃ-সমীক্ষার জ্ঞানকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সম্পর্কে ডাঃ বসু, শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র, শ্রীগোপেশ্বর পাল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

য়ুরোপে ডাঃ সিগমুণ্ড ফ্রয়েড নিজে পরীক্ষা করে' এবং রোগীদের চিকিৎসা করে' যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ করলেন, তাই ক্রমে মনঃ-সমীক্ষা নামে বিজ্ঞানে প্রচলিত হ'ল। সাধারণতঃ যাঁরাই মনঃ-সমীক্ষক হয়েছেন তাঁরা নিজেরা সমীক্ষিত। কারণ ফ্রয়েড কিংবা তাঁর শিষ্যগণের প্রবন্ধ বা পুস্তক মনোযোগ দিয়ে পড়লেই সমীক্ষণ-বিদ্যা অধিগত করা যায় না। নিজের মনের সমীক্ষা অপরের দ্বারা না হ'লে এবং পরে অপরের মনকে সমীক্ষিত না করলে এ-বিদ্যার জ্ঞান সম্যক উপলব্ধি হয় না। ফ্রয়েডের আগে কোন সমীক্ষক ছিল না বলে' যেমন তাঁর মন অন্যের দ্বারা সমীক্ষিত নয়, তিনি নিজে স্বপ্ন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নিজের নির্জ্ঞান মনকে জেনেছেন এবং পরে রোগীদের ওপর সমীক্ষণ প্রয়োগ করে' সমীক্ষক হয়েছেন, তেমনি ভারতবর্ষে

ডাঃ বসুর আগে কোন মনঃ-সমীক্ষক ছিলই না, এমন কি, Psycho-analysis (মনঃ-সমীক্ষা) কথাটাও সাধারণের কাছে তত পরিচিত ছিল না। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ থেকে তিনি নিজে উক্ত বিজ্ঞানের চর্চ্চা করে' আসছেন। সেই সময় ইংলণ্ডেও মনঃ-সমীক্ষা প্রচার পায় নি। আজ পর্যন্ত ডাঃ বসু বহু রোগীর চিকিৎসা করেছেন। তাঁর এত দিনের অভিজ্ঞতার ফলে তিনি মানুষের মন সম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ করেছেন ১৯৩৩ সালের Indian Journal of Psychology পত্রিকার Wundt-সংখ্যায় A new theory of mental life নামে বৃহৎ প্রবন্ধে তার বিশদ ও বিশেষ আলোচনা করেছেন। মানুষের মন সম্বন্ধে জ্ঞানের বহু স্থলে তাঁর সঙ্গে ডাঃ ফ্রয়েডের মেলে নি। ফ্রয়েডের মতে সমাজ, সুনাম, যশ, আচার, ধর্ম্মের রীতি-নীতি, ভয়, ঘৃণা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তির অনুশাসন আমাদের মনের ইচ্ছার প্রকাশে বাধা দেয়। বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আমাদের রুদ্ধইচ্ছা নির্জ্ঞান মনে স্থিতিলাভ করে। ফ্রয়েড যে প্রথায় ইচ্ছানিরোধ নির্দ্ধারণ করেছেন ডাঃ বসু তা থেকে অন্যপথ স্থির করেছেন। তাঁর মতে, যতক্ষণ না একটী ইচ্ছা অপর ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিপরীতগামী হয়, ততক্ষণ সে ইচ্ছানিরোধের সম্ভাবনা থাকে না। ভয়, ঘৃণা প্রভৃতি ফ্রয়েড যেগুলিকে ইচ্ছানিরোধের (repression-এর) কারণ বলে' ধরেছেন, গিরীন্দ্রশেখর সেগুলিকে ইচ্ছানিরোধের ফল বলে' স্থির করেছেন। এই প্রবন্ধে উভয়ের মতের সত্যাসত্য বিচার করা সম্ভব নয়। তবে ফ্রয়েডের সঙ্গে ডাঃ বসুর অনৈক্যটুকু বলা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত ভাবে আমি ডাঃ বসুর মতকে স্বীকার করি। এবং ছোট ছেলে মেয়েদের দুষ্টামির কারণ অনুসন্ধানে আমি ডাঃ বসুর মতকে সমর্থন করবার তথ্য পেয়েছি। যেমন পদার্থ-বিজ্ঞানে আমরা শুনি, দুইটী গতি একই plane-এ না হ'লে, তাদের মধ্যে সংঘাত সম্ভব নয়; আরও, একই ক্ষেত্রে (plane) অধিষ্ঠিত হলেও এদের গতির দিক্‌রেখা (Line of force) সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী না হ'লে বিরোধ সম্পূর্ণ হয় না; মনের ইচ্ছার সম্বন্ধে ডাঃ বসু সেই কথাই বলেন—যতক্ষণ না দুইটী ইচ্ছা বিপরীতগামী হয় ততক্ষণ তাদের মধ্যে বিরোধ অসম্ভব। উদাহরণ দিয়ে কথাটা বোঝবার চেষ্টা করি। ধরুন, আমার মনে একটী ইচ্ছা আছে, যথা—আমি রামকে মারতে চাই।

এ ক্ষেত্রে—১। আমি শ্যামকে মারতে চাই।
২। শ্যাম রামকে মারতে চায়।
৩। শ্যাম আমাকে মারতে চায়।
৪। আমি রামকে মারতে চাই না।

৫। রাম শ্যামকে মারতে চায়।—এর একটীও 'আমি রামকে মারতে চাই' এর বিপরীতমুখী হ'ল না। একটু ভেবে দেখলে দেখা যাবে যে, 'আমি রামকে মারতে চাই' এবং ১, ২, ৩, ৪ সংখ্যক যে-কোন একটী, একসঙ্গে মনে থাকতে পারে এবং বিনা বিরোধে তৃপ্ত হ'তে পারে। ৪ সংখ্যক ইচ্ছাটী আমাদের প্রাথমিক ইচ্ছার প্রকাশে অনিচ্ছা মাত্র। অতএব সেখানে বিরোধ অজানা রইল। কিন্তু যদি আমার মনে এমন ইচ্ছা আসে যে 'আমি রামের দ্বারা প্রহৃত হ'তে চাই,' তবেই বিরোধের সৃষ্টি হ'ল। এই বিরোধের ফলে পারম্পরিক শক্তি অনুযায়ী একটী ইচ্ছা নিরুদ্ধ হ'তে পারে। ডাঃ বসুর মতে আমাদের মনে সব সময়ই এই ধরণের যুগ্ম ইচ্ছা দেখা দিচ্ছে। তিনি বলেন, শিশু যখন পৃথিবীতে এল, তখন তার দৈহিক ও মানসিক অপরিনতির জন্য তার মনে নিজে কোনো-কিছু করবার ইচ্ছা থাকে না। সে তখন মায়ের কাছে অসহায় অবস্থায় থাকে। মা তাকে লালন পালন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে উপলক্ষ করে' নিজের অনেক ইচ্ছা তৃপ্ত করে। শিশু এই মায়ের ইচ্ছার তৃপ্তির পথে কারণ হয়ে ক্রমশঃ নিজের ইচ্ছাকে তৃপ্ত করতে চায়। তখন সে তেমন ইচ্ছাই তৃপ্তি করতে চায়, এতদিন তার ওপর দিয়ে যে-গুলি তৃপ্ত হয়ে এসেছে। এই সময় থেকেই 'নিজে করবার' এবং 'নিজের ওপর করানো' এই দুই ইচ্ছা শিশুর মনে দেখা দিতে থাকে। ডাঃ বসুর মত অনুযায়ী যখন আমরা অপরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হই, তখন অনেক সময় আমাদের দুই বিপরীতমুখী ইচ্ছা একই সময় তৃপ্ত হয়ে মনে শান্তি এনে থাকে।

ভারতবর্ষে মনঃ-সমীক্ষার প্রচারে শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ যোগ্য। ভারতীয় মনঃ-সমীক্ষা সমিতির তিনি যোগ্য সম্পাদক। ডাঃ বসুর নেতৃত্বে এবং ডাঃ মন্মথবাবুর সম্পাদনায় ভারতীয় মনঃ-সমীক্ষা উন্নতির দিকে যাচ্ছে।

য়ুরোপে ডাঃ সিগমুণ্ড ফ্রয়েডকে যেমন নিন্দা এবং অপবাদ সহ্য করতে হয়েছে, ভারতের মনঃ-সমীক্ষার নেতা গিরীন্দ্রশেখরকে মোটেই তা পেতে হয় নি। তাঁর মন-সমীক্ষা সম্বন্ধে যে-সব প্রবন্ধ তিনি সাধারণের জন্য লিখেছেন, সেগুলিকে বোঝবার চেষ্টা করে' সম্মান দেখান না হ'লেও তাঁর প্রতি কেউ বিরক্ত হন-নি। কিন্তু একথা স্বীকার করতে হবে, অনেক ক্ষেত্রে মনঃ-সমীক্ষার জ্ঞানের অযথা ব্যবহার ও ভুল বোঝা হয়েছে। আগেই বলেছি, মনঃ-সমীক্ষা শিখতে গেলে নিজের মনকে অপর সমীক্ষকের দ্বারা সমীক্ষিত হতে দিতে হয় নতুবা সমীক্ষন-বিদ্যা সম্যক ভাবে উপলব্ধি করা যায় না। অনেক লেখকের লেখায় সেই ভুল-বোঝা দেখা গেছে। তাঁরা ফ্রয়েডের কিংবা তাঁর কোন শিষ্যের লিখিত পুস্তক ভাল করে', না পড়ে', এবং না বুঝে,

মনঃ-সমীক্ষার জ্ঞানকে বক্রভাবে ব্যবহার করেছেন। অনেকে আবার যৌন-সম্পর্কীয় যে-কোন মতকে নিজের মনে তৈরী করে' ফ্রয়ডের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। আবার অনেকে ফ্রয়ডের কোন বই না পড়ে' তাঁর কোন ইংরাজ প্রতিদ্বন্দ্বীর নিন্দাবাদ পড়ে' ফ্রয়ডের মতবাদ সম্বন্ধে ভুল ধারণা করে' মনঃ-সমীক্ষার প্রতি বক্রদৃষ্টি ক্ষেপ করেছেন। সে-ব্যবহার কোন লেখক বা শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে শোভন হয় না। ফ্রয়ডের মতকে নিন্দা বা ভুল প্রমাণ করতে গেলে তাঁর জ্ঞানকে উপলব্ধি করতে হবে। তার জন্য নিজেকে সমীক্ষক হ'তে হবে। Complex, Oedepus, Ego, Libido প্রভৃতি কথাগুলির অর্থ সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম না করে' ব্যবহার করা অন্যায়। ঐ কথাগুলি কোনো বিজ্ঞানের বিশেষ সংজ্ঞাপূর্ণ বাক্য। বিজ্ঞান মাত্রেই তার কতকগুলি বিশিষ্ট বাক্য থাকে। তার ব্যবহার বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত!

ভারতের মনঃ-সমীক্ষা বৈশিষ্ট্যলাভের পথে চলেছে। ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু ভারতবাসীর মনের গতি লক্ষ্য করেছেন। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটী স্বতন্ত্র বিচার-পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। তাঁর নির্জ্ঞান মনের পরীক্ষার পথ ফ্রয়ডের মতই। কিন্তু ডাঃ ফ্রয়ড নিজের পরীক্ষা থেকে যে সত্যে উপনীত হয়েছেন ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর নিজের পরীক্ষার বলে সে-সমস্তকে সত্য বলে' মেনে নিতে তথ্য পান নি। ফ্রয়ডের সঙ্গে গিরীন্দ্রশেখরের ঐক্য এবং অনৈক্য বিশদভাবে আলোচনা এ-প্রবন্ধে করা চলে না। তবে আমার মনে হয় বসুর মতবাদ সরল এবং তথ্যকে ব্যাখ্যা করতে পারে। আগেই দেখিয়েছি মনে ইচ্ছাকে নিরোধ করার গতিবিধি বিষয়ে তিনি ফ্রয়ড থেকে স্বতন্ত্র। এবং ফ্রয়ড অনেক স্থলে যে-সব মনোবৃত্তিকে প্রাথমিক কারণ বলে' স্বীকার করেছেন, ডাঃ বসু সেগুলিকে প্রতিক্রিয়ার ফল এবং অপরের ওপর নির্ভরশীল বলে' বিবেচনা করেছেন। বসুর এই স্বাতন্ত্র্য ভারতে নব সমীক্ষকের দল গঠনে সক্ষম হবে।

মানসিক রোগ ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা যায়। অনেক সন্তানদের দেখা যায় লেখাপড়ায় মোটেই মন নেই, কিংবা বয়স অনুযায়ী কার্য্যকরনে অক্ষম, বাইরের লোকের সঙ্গে মিশতে মোটেই পারে না। এই ধরণের শিশুদের problem child বলা হয়। মনঃ-সমীক্ষা এই শিশুদের সুস্থ করবার চেষ্টা করেছে। অনেকের ধারণা, সমীক্ষিকারাই মানসিক দৌর্ব্বল্যসম্পন্ন শিশুদের আরোগ ভাল করতে পারে। শিশুদের সঙ্গে মেয়ের ঘনিষ্ঠতা বেশী। ফ্রয়ডের মেয়ে আনা ফ্রয়ড, শ্রীমতী মিলেইনে ক্লাইন্ প্রভৃতি সমীক্ষিকাগণ মনঃ-সমীক্ষার এই বিষয়ে অগ্রগণ্য হয়েছেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেদের সুষ্ঠুভাবে মিলিয়ে নিতে পারা জীবনযাত্রার পক্ষে প্রয়োজনীয়। শিশুদের সেই ক্ষমতার অভাব হ'লে এঁরা তার চিকিৎসা করে' সুস্থ করে' দিচ্ছেন। শ্রীহরিপদ মাইতি মহাশয় সম্প্রতি মনঃ-সমীক্ষার সেই বিষয়ে মন দিয়েছেন। এইখানে ভারতে নারী-সমীক্ষকের অভাব বোধ হয়।

প্রবন্ধ শেষ করবার আগে সমীক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলব। মনঃ-সমীক্ষা অত্যন্ত দুরূহ এবং ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। মানসিক উন্নতির অভিলাষী হয়ে যাঁরা আসেন কিংবা যাঁরা ছাত্র হিসাবে আসেন, দু'জনকেই কোন নির্জ্জন কক্ষে—যেখানে আলোকের মাত্রা এবং অন্য প্রকারের ব্যাঘাতের সম্ভাবনা কম—সমীক্ষার্থীকে ঋজু এবং সহজভাবে শয়ান হ'তে হয়। তারপর চোখ বন্ধ করে' যা মনে আসে সব নিঃসঙ্কোচে বলে' যেতে হয়। ঘরে ঢোকবার আগে সমীক্ষী ও সমীক্ষকের মধ্যে এই মর্ম্মে সর্ত্ত হয় যে, সমীক্ষীর মনে যে-কোন ভাব আসুক, তা' অযৌক্তিক, রহস্যজনক কিংবা অসংবদ্ধ বলে' মনে হ'লেও, তিনি বলে' যাবেন, গোপন করবেন না। সমীক্ষক সমীক্ষীর সর্ব্বপ্রকার অঙ্গভঙ্গী, ব্যবহার এবং চিন্তাধারা নিজের অভিমত প্রণালী অনুযায়ী লক্ষ্য করেন এবং লিখে রাখেন। পরে সমীক্ষীকে উঠে বসতে বলে' তার চিন্তা এবং ব্যবহারের ভেতর দিয়ে নির্জ্ঞান মনের যে অনুসন্ধান পেয়েছেন বোঝাতে চেষ্টা করেন। দিনের পর দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুনরায় ঐ রকম ব্যাপারের অনুষ্ঠান হয়। বিনা-পারিশ্রমিকে এই কার্য্য সম্ভবপর এবং ফলদায়ী হয় না। দায়িত্বহীন ব্যাপার নির্জ্ঞানের কাছে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে গৃহীত হয়। এইটাই সমীক্ষকগণের মত। শিক্ষার্থীর পক্ষে ৫০০ শত অধিবেশন প্রয়োজন। এবং মানসিক ব্যাধি উপশমের জন্য রোগী ২৫০ অধিবেশনের আগে নিরাময়তা আশা করতে পারেন না। সময়ানুবর্ত্তিতা অতি কঠোরভাবে সমীক্ষীর কাছ থেকে আশা করা হয়। সমীক্ষা-কার্য্যে নিজ গত-জীবনের গোপনীয় ব্যাপার প্রকাশ করতে স্বাভাবিক অনিচ্ছা ব্যতীত নির্জ্ঞান থেকে গুরুতর বাধা এসে সমীক্ষণের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত বাধা সমীক্ষক ধীরে ধীরে অপসারিত করে' রোগীকে সহজ করে' নিয়ে আসেন। এবং অসংলগ্ন, অযৌক্তিক প্রভৃতি কথা চিন্তা বা কার্য্যের সাহায্যে তিনি নির্জ্ঞান মনের আন্দাজ পান, পরে সমীক্ষণ দ্বারা তিনি সেগুলি সমীক্ষীর কাছে উদ্ঘাটিত করে' দেন। নির্জ্ঞান মনের কার্য্যকলাপ তার সম্যক উপলব্ধি হ'লে সমীক্ষী সুস্থ হয়ে' ওঠে এবং সমীক্ষণ শেষ হয়। বয়সের আধিক্য এবং রোগের গুরুত্ব অনুযায়ী চিকিৎসা চার বৎসর বা ততোধিক কাল স্থায়ী হয়। সুতরাং, মানসিক রোগের প্রথম অবস্থায় সমীক্ষকের কাছে নিয়ে যাওয়া ভাল।

দামী জুতো

১৯০৮ সালে এই জুতো জোড়া অ্যামেরিকার মিস্টার মর্গান কিনেছিলেন, দাম ছিল গোটা আটেক টাকা। তারপর ভদ্র লোক এই জুতো জোড়া দিয়েই আজ অবধি চালিয়ে আসছেন।

১৯৩৮ সাল অবধি, মানে, ত্রিশ বছরে, ভদ্রলোক জুতোজোড়া মেরামৎ করতে এগারো হাজার টাকার ওপর ব্যয় করেছেন! তাঁ'র অনুরাগীরা ঠিক করেছে, ভদ্রলোকের মৃত্যুর পর, জুতোজোড়া এক অ্যামেরিকান মিউজিয়ামে দিয়ে দেবেন।

ব্যাক্-রেস্

দক্ষিণ অ্যামেরিকার কোনও একটি রাষ্ট্রের ট্যাঁকে এমন পয়সা ছিল না যা'তে কিনা ওখানে একখানা রেললাইনের বেশি দু'খানা লাইন পাতা যেতে পারে। ফলে, ওখানে যে ইঞ্জিন গাড়ীটাকে টেনে নিয়ে যায়, সেটাই আবার পেছন থেকে ঠেলে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। এই ওখানকার ব্যবস্থা। একদিন রাত দুপুরে এক নেক্ড়ে বাঘ ইঞ্জিনটাকে কর্‌ল তাড়া; ড্রাইভার প্রাণের ভয়ে এমন বেগে গাড়ীটাকে ঠেলে নিয়ে চল্‌ল, যাকে কিনা বলা যেতে পারে একেবারে 'চোখ কান বুজে ঠেলা'! স্টেশনের পর স্টেশন পার হ'য়ে গেল, ড্রাইভারের খেয়াল নেই। শেষ অবধি···থাক্ সে কথা। কিন্তু এই ব্যাক্-রেস্, রেলোয়ের ইতিহাসে এতই অদ্ভুত হ'য়েছিল যে, মায় রাষ্ট্রাধিপতি অবধি ভড়্‌কে গিয়েছিল।

কোষ্ঠির ফলাফল

লণ্ডন হাসপাতালে একটি মেয়ে জন্মেছে যা'র ওজন সাত পাউণ্ড্ এগারো আউন্স্ জন্মসময় হচ্ছে সন্ধ্যা সাতটা এগারো মিনিট, আর হাসপাতালের যে ঘরটিতে জন্ম হয় সেটির নম্বর হচ্ছে সাতশো এগারো। সপ্তাহের সাতবারের কোন্ বারে এই অঘটনটি ঘটেছিল, মাত্র সেইটিই জানা যায় নি।

সিগ্রেটের সংবাদ

সিগ্রেট-খোর যাঁ'রা তাদের মধ্যে শতকরা চুয়ান্ন জন লোক আঙুলের ডগায় বা দেশলাই-এর বাক্সে সিগ্রেট ঠুকে' ধরিয়ে থাকেন, এটা আপনারা লক্ষ্য করে' থাক্‌বেন। এবং এই সিগ্রেট পায়ীদের ভেতর শতকরা বায়ান্ন জন যে-দিকটা ঠুকে' থাকেন সেদিকটা ঠোঁটে দেন, শতকরা একুশ জন না-ঠোকা দিকটা ঠোঁটে দেন, আর শতকরা সাতাশ জন কোন দিকটা ঠোঁটে দিচ্ছেন সে-দিকে খেয়াল করেন না মোটেই। কতক লোক আছেন যাঁ'রা কেবল মাত্র সিগ্রেটের গন্ধটুকু পা'বার জন্যই ধূমপান করেন, কতক আছেন যাঁ'রা ধোঁয়াটা দেখ্‌বার উদ্দেশ্যেই ধূমপান করেন—এঁ'রা অন্ধকারে ধূমপান করে' আরাম পান না। আবার অনেকে আছেন যাঁ'রা কেবল মাত্র আঙলে টিপে' ধরেই সিগ্রেট্ খাবার সুখ পেয়ে থাকেন।

মনে রাখার মতো

ইংল্যাণ্ডের একটি রেলোয়ে স্টেশনের নাম আছে যা' আপনার সাধ্য নেই যে উচ্চারণ অবধি কর্‌তে পারেন। মজা হচ্ছে এই যে ইংল্যাণ্ডের পোস্ট্ অফিসের কর্তারা ইস্তাহার দিয়েছেন যে এই জায়গাটির প্রথম বিশটি অক্ষর লিখ্‌তে পারলেই চিঠিখানা যথাস্থানে পৌছতে পার্‌বে।

বাঙ্গালীরা বাঙ্গলা দেশের নয়

কেননা, বামুন এবং কায়েৎদের মধ্যে যা'রা কুলীন তা'রা এসেছে কনৌজ থেকে, যা'রা জমিদার তা'রা অবাঙালী, যা'রা নিম্নশ্রেণীর হিন্দু তা'রা অনার্য্য, মানে, বাইরে থেকে এসেছে, যা'রা মুসলমান তা'রা আরব দেশকে পিতৃভূমি বলে' মনে করে, ফিরিঙ্গিরা সায়েবদের বাচ্চা—ইংল্যাণ্ড তা'দের দেশ, উত্তর বাংলার লোকরা নাকি এসেছে আসাম থেকে, চাটগা বিভাগের লোকরা এসেছে আরাকান থেকে! তা' হ'লে রইল কা'রা?

মৃত্যু

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বাধ্যক্ষ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের মৃত্যু ঘটেছে।

বৈষ্ণব-তত্ত্বগ্রন্থ প্রণেতা বনোয়ারী লাল গোস্বামী মারা গিয়েছেন।

নদীয়া জেলার ইতিহাস-লেখক কুমুদ বিহারী মল্লিক মারা গিয়েছেন।

পতাকা বিভ্রাট

গান্ধীজির বহুঘোষিত 'শ্রেষ্ঠ ভারতীয় নরপতি' মহীশূর রাজের সৈন্যরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা-উৎসবে যোগদানকারীদের প্রতি গুলিবর্ষণ করে। ফলে বত্রিশ জন মারা গিয়েছে।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন

বাংলা দেশের আইন সভায় জমিদারদের সমবেত বিরোধিতা সত্বেও বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল; এই আইনের বলে জমিদারদের স্বার্থ অনেক ক্ষুণ্ন হয়। আইন প্রচলিত হবার পূর্বে গভর্ণরের অনুমোদন চাই। জানা গিয়েছে, গবর্ণর ভারত-সচিবের নির্দেশ অনুসারে অনুমোদন দেন নি।

সিভিল সার্ভিস্ চাকুরের কর্ম্মত্যাগ

মধ্য প্রদেশের জনৈক আই. সি. এস্ কর্মচারী মিস্টার সি. ভি. কামাথ চাকুরীতে ইস্তফা দিয়েছেন। ভদ্রলোক জানিয়েছেন যে তাঁ'র দেশপ্রেম অত্যুগ্র হ'য়ে উঠেছে বলে' তিনি মনে করেন—যেহেতু 'শোষিত জনের অর্থেই যে-ইংরেজ বিত্তশালী' তা'র অধীনে নোক্‌রী করা তাঁ'র পক্ষে আর পোষাবে না।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তক

লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্যমে 'অতীত ভারতের রূপ-উদ্ঘাটন' নামের একখানা বই প্রকাশের সাহায্যার্থে ভারতের বিভিন্ন মিউজিয়্যামের কর্তারা এবং বহু বিদেশী এবং ভারতীয় শিল্পীরা শ্রম করবেন বলে' স্বীকৃত হয়েছেন।

স্বাধিকারপ্রমত্তা

দেরাদুনের মহাদেবী কন্যা পাঠশালা কলেজের প্রিন্সিপালের অনুমতি ছাড়া বাইরের পুরুষ জাতীয় লোকেরা বোর্ডার মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। এই আদেশ বাতিল করবার উদ্দেশ্যে মেয়েরা অনশন ধর্মঘট সুরু করেছে।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র

কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র ট্রেনে প্রথমশ্রেণীর কামরায় চেপে সিলেট ও শিলচর অঞ্চলে বক্তৃতা ও বিবৃতি প্রচার ব্যাপদেশে গমন করেছেন। সফরের চারদিন সময়ের মধ্যে চাঁদপুর স্টেশনে স্টীমারের দোতলা থেকে তীরের লোকদের লক্ষ্য করে' হিট্‌লারের মতো নাটকীয় বক্তৃতা প্রয়োগ করেছেন, তিনি কংগ্রেসের প্রতি মিঞা ও মেয়েদের দরদ আকর্ষণ করেছেন ও তাঁদের ক্রম-বাড়ন্ত দরদে আনন্দিত হয়েছেন, বঙ্গীয় কংগ্রেসে দলাদলি দূর হয়েছে বলে' আত্মসুখ লাভ করেছেন, ঢাকার অনশনব্রতী বন্দীদের জন্য সদা-উদ্বিগ্ন রয়েছেন, বীরভূমে কৃষক-সম্মেলনে বাণী প্রেরণ করেছেন, পাষণ্ড ইংরেজরা এখনো এদেশ ছেড়ে' চলে' যায়নি বলে' দুঃখিত হয়েছেন, ভক্তদের বাড়ীতে নৈশ আহার করেছেন, বালিকাদের অভিনন্দন সঙ্গীত শুনেছেন, চাষীদের কষ্ট লাঘবার্থে বিগলিত হৃদয়ে দুর্গম দূর পল্লীগ্রামে মোটরে চড়ে' গিয়েছেন; এবং শেষ অবধি কল্‌কাতায় ফিরেছেন।

জাপানের নাকে খৎ

জাপানী বোমারু বিমান থেকে বোমা মেরে' মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ 'প্যানে'কে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছিল; জন কয়েক মার্কিন কর্মচারী মারা গিয়েছিল। মার্কিন রাষ্ট্রের ধমক খেয়ে জাপানী সরকার প্রায় বিশ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিয়ে দিয়েছে।

সাহিত্যের খবরদারী

মারাঠি নেতা বিনায়ক সাভারকর একটি বক্তৃতায় বলেছেন যে বিদেশী শব্দ একেবারে বাদ না দিলে ভারতীয় ভাষাগুলি সমৃদ্ধশালী হ'তে পারবে না।

বৌদ্ধ পণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়ন পাটনায় এক বক্তৃতায় হিন্দী ভাষার মধ্যে বিদেশী শব্দ প্রবর্তন করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

কংগ্রেসী মন্ত্রিদের সাম্যবাদে বিরাগ

মাদ্রাজ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তেলেগু ভাষায় লিখিত রাশিয়ায় বিপ্লববাদ সম্পর্কিত একটি সাম্যবাদী বই-এর প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

জীবনের চলার পথে

অতুল ভট্টাচার্য্য

আজ সলিলের সকাল করে' অফিস থেকে ফেরবার কারণ ছিলো। আজ সে অমিতাকে চম্‌কে দেবে,····· তারপর তার সেই চম্‌কানির খুশী থেকে যা আদায় করবে, তা-ও তার বিলক্ষণ জানা আছে!

আজ বছর দুই হয় তাদের বিয়ে হ'য়েছে। সলিলের কেরাণী-জীবনের পক্ষে দু'টো বৎসর সুদীর্ঘ কালই বটে, কিন্তু নববিবাহিত তরুণের পক্ষে তা কতটুকুই বা!······

সলিল এলো। তখন পল্লীর সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। যে-ট্রেনে সে কলকাতা থেকে এলো, তার গর্জ্জন অদূরে এখনও শোনা যাচ্ছে! এমনি সময়, পা টিপে টিপে,—তাকে দেখ্‌লে অকস্মাৎ চোর ব'লে মনে হয়—সে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বাড়ী পোঁছলো। অমিতা তখন বিছানাটা ঠিক ক'রে রাখ্‌ছিল। মনটা তার ভাল নেই—কখন যে সলিল আসবে কে জানে! ডেলী প্যাসেঞ্জার, প্রথম গাড়ীখানা ফেল করলেই···! ···অমিতা বেলা না পড়তেই ঘরের কাজ কর্ম্ম সেরে প্রস্তুত হয় তার আদর-অভ্যর্থনার জন্য! গা'-ধোওয়া, চুল-বাঁধা, টিপ্‌-পরা, আলতা রাঙ্গা,···এমনি কত কি, সযত্নের সামান্য নিখুঁত প্রসাধন। অন্ধকার ঘনিয়ে এলেই সে উৎসুক হয়ে ওঠে...প্রত্যেকটা ট্রেনের শব্দে তার বুক কাঁপে...প্রত্যেকটী লোকের পায়ের শব্দে সে ভাবে এই বুঝি···! কিন্তু আশা তার পূর্ণ হয় না...। সলিল হয়তো আসতে পারেনি কোন অনিবার্য্য কারণে! তার দুই ভারী চোখের পাতা জড়িয়ে আসে,···দু'পায়ের ডগ্‌ডগে লাল আলতা শুকিয়ে কুঁক্‌ড়ে যায়। ···হয়ত বা সে ঘুমিয়ে পড়ে।···

কখন আজ আস্‌বে সলিল,—সে ভাবছিল! সাতটা তো বাজে বাপু্‌!···আচ্ছা, আপিসের বড়বাবুর বুঝি বিয়ে হয়নি কোনদিন! মাগো, অমিতা মনে মনে তার হৃদয়হীনতা কল্পনা করে' শিউরে ওঠে।

তার পেছনে যে কে এসে দাঁড়ালো, সে তা টের পেলে না, —এমনি গভীর তার চিন্তা! হঠাৎ কা'র দু'টী হাত তার দু'চোখ টিপে ধরলে।

অমিতা প্রথমে চম্‌কে উঠলো। তারপর,...এই দু'টী সুপরিচিত হাত চিন্‌তে তার বিশেষ কষ্ট হ'ল না। নিয়ম মত নাম বলতে হয়। অথচ হিন্দুর মেয়ে হ'য়ে স্বামীর নাম···

সে বলে, "জানি গো, জানি। তুমি!"

সলিল গলা মোটা করে', মুচ্‌কে হেসে বলে, "কে? অশোক?"

অশোক অমিতার ভাই।

অমিতা বল্লে, "ধ্যেৎ!"

"তবে?"

"তুমি গো!"

সলিলও তার মত টেনে বলে, "কেগো!"

অমিতা রেগে বলে, "জানিনে বাপু, বল্‌ছি তুমি!"

"বলই না আগে কে আমি!"

"ওই যে, যা' লোকে খায়!"

যা লোকে খায় মানে জল, অর্থাৎ সলিল!

এ রকম ঠাট্টা অনেকদিনই হ'য়ে থাকে! "ওই যে, যা লোকে খায়" এর মানেও সলিল জানে! কিন্তু ভিজে বেড়াল হ'য়ে বলে, "কি গো, ভাত?"

"না।"

সলিল খুব ভেবে বল্লে, "ডাব?"

"কাছাকাছি! ওই যে—"

"কাছাকাছি? ডাবের কাছাকাছি আর কি আছে বাপু্‌?—গাছের ডগায় আর কি হয়?···ওহো। তাল?"

অমিতা হেসে ফেলে, বলে, "হুঁ, তাল না হাতী।···ওই যে যা খেলে প্রাণ বেঁচে থাকে···ভয়ঙ্কর তেষ্টা!"

সলিল এবার বুঝতে পেরেচে। হাঁপ ছেড়ে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বল্লে, "ও কপাল! সরবৎ? তাই তো কলকাতায় যা গরম! সরবৎ না হ'লে চলে কক্ষনো?—তাই বলো······"

অমিতা রাগে ভেংচি কেটে বলে, "বলচি, যা' খেলে তেষ্টা যায়, সবখানেই, সহরেও, পাড়াগাঁয়েও,—যেখানে সরবৎ নেই, তবু বলবেন, সরবৎ!"

সুতরাং সলিলকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়, সে বুঝতে পারেনি! অমিতা তখন গুরুগিরি করে, "বলে, জল, জল, জল!"

সলিল গভীর বিস্ময়ে বলে, "জল? হরি, হরি! আমার ও না-দেওয়া নামটী কোত্থেকে আবিষ্কার করলেন, সার?"

অমিতা গম্ভীর হ'য়ে বলে, "এই বিদ্যেয় চাক্‌রী করো?··· বল, জল মানে কি?"

সলিল দুষ্টুমি করে' নিরীহের মত বলে, "পানীয়?"

"ভাগ্" বলে' অমিতা কালি-কলম নিয়ে আসে। তারপর বড় বড় অক্ষরে লিখে দেয়, জল মানে সলিল।

খুনসুটির পর্ব্ব শেষ করে' সলিল খাবার পর্ব্বের জন্য প্রস্তুত হয়। জামা-কাপড় ছেড়ে, হাতমুখ ধুয়ে নিতে তার বিশেষ দেরী হ'ল না। রান্নাঘরের একধারে পাশাপাশি দু'খানি ঠাঁই করা আছে। ওরা দু'জনে এখানে আসার পর আজ কয়েক মাস হয় একই সময়, প্রায়দিন একই সঙ্গে, এবং মাঝে মাঝে রাগারাগি, অভিমান হ'লে ভিন্ন বসে' খায়। আজ উভয়ের মন ভাল। সুতরাং একখানা ঠাঁইকে অবজ্ঞার ব্যথা সইতে হ'ল।

উভয়ে খেতে বসেছে, একসঙ্গে! আহারের সামগ্রী কিছু নেই বল্লেই হয়;—একটুখানি ডাল, এবং হয়ত কি একটা তরকারী!

সলিল পাতে ডাল ঢেলে বলে, "মাখো!"

অমিতা মাখে।

সলিল বলে, "খাও!"

কিন্তু অমিতা খাবে না আগে, কিছুতেই না!

সলিল বলে, "খাও না গো! মাগো, কি তোমাদের সংস্কার, স্বামীর আগে খেতে নেই! আচ্ছা, এই আমি খাচ্ছি বাপু, এখন তুমি খাও দিকিন্!"

অমিতা মাথা গুঁজে বসেছিল, এইবার এক গ্রাস হাতে তুলে নিলে।

তারপরে ওরা খায়। অমিতা ভাত মেখে হাতে নিয়েচে, খাবে এখুনি। সলিল সহসা সে হাতখানি তার মুখের কাছে টেনে এনে নিজেই খেয়ে ফেলে। অমিতা হাসে, বলে, "এতও পারো তুমি!"

নানা গল্পে দু'জনের খাওয়া চলে!

আলোটা নিবিয়ে দেওয়া হয়নি এখনও। খোলা জানালা দিয়ে ভারী মিষ্টি বাতাস বইছে, ঝির্‌ঝিরে হাওয়া!

সলিল বলে, "পেট ভরলো না মোটেই!"

অমিতার লজ্জা করে, কি জানি সত্যিই যদি ঠাট্টা না হয়! না না, ছিঃ, সে আর কক্ষনো একসঙ্গে খাবে না! আগে ও-কে খাইয়ে তারপর যদি ভাত থাকে তো সে খাবে, না হয় উপোষ করবে। একবেলা না খেলে আর মানুষ মরে' যায় না!

সলিল বলে, "ওগো!"

অমিতার উভয় সঙ্কট। ঘরে এমন কিছু নেই যে তাই দিয়ে বলে, খাও! কিন্তু নেই বলতেও তার লজ্জা!·· সেপাশ ফিরে শোয়।

সলিল বলে, "নেই কিছু?"

অমিতা মৃদুস্বরে বলে, "না!"

"না, নেই, আমি বুঝি আর জানিনে!"

অমিতা ঘুরে হেসে বলে, "সত্যি, নেই কিচ্ছু!"

কিছুক্ষণ চুপচাপ···

তারপর ক্ষিদের অজুহাতে সলিল অমিতাকে অনর্থক খানিকটা উত্যক্ত করে, রসিকতা করে। কখনো বা তা'তে অমিতার হয় অভিমান—আবার সলিল নরম আদরে সে-অভিমানে ইতি টেনে দেয়।

আবার চল্‌তে থাকে ওদের অফুরন্ত গল্পস্রোত!"...

এক সময় সহসা অমিতা থেমে যায়, তার কোন এক কথা স্মরণ হওয়ায় সে বলে, "কাল কি বার গো?"

সলিল খুশী হ'য়ে জবাব দেয়, "সুখবার!"

অর্থাৎ শনিবার, সুখের বার! সকাল সকাল আপিস ছুটী। পরের দিনের জন্য আপিসের চিন্তা নেই। রাত্রে ঘুমের ঘোরে বড়বাবুর ভ্রূকুটী দেখে শিউরে উঠবার ভয় নেই···নেই রাত না পোয়াতেই পরিশ্রান্ত অতৃপ্ত মনকে ঘুম থেকে জোর করে' টেনে তুলবার তাড়া...পরন্তু রবিবারের পরিপূর্ণ সুখ...অমিতার সঙ্গে সেই সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি ছেলেমানুষের মত খেলা এবং দুষ্টুমি...

অমিতা বলে, "মনে আছে?"

"কি গো!"

"সেই যে, আলিপুর, ভিক্টোরিয়া, মিউজিয়ম!...দেখাবে বলেছিলে রবিবারে,...যাবে ঠিক?"

সলিলের সমস্ত আনন্দ-চিহ্ন নিঃশেষে বিলুপ্ত হ'য়ে যায়! অন্ধকারে তার মুখের কালিমা বোঝা যায় না। কিন্তু সে বলে, "হ্যাগো, ঠি—ক যাবো!"

অমিতা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলে, "হ্যাগো, আছে ঠিক বাঘ, মিছে না ত?"

তার এই ছেলেমানুষের মত কথাবার্ত্তা শুনে সলিলের কাতর মুখেও হাসি ফুটে ওঠে, বলে, "হ্যাঁ, ঠিক আছে! ক-ত, তিন চারটে হবে বোধহয়।"

এই আলোচনা যে কতদিন হ'য়ে গেছে, তার আর ঠিকানা নেই। অমিতা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, এ পর্য্যন্ত আলিপুরের চিড়িয়াখানায় যায়নি, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালও দেখেনি, কিংবা যাদুঘরের সিঁড়িতে উঠেও তাকে ধন্য করে' দেয় নি! তবুও... সলিলের কাছে শুনে শুনে তার সব মুখস্থ হ'য়ে গেছে! আলিপুরের 'মেন্ গেট' দিয়ে ঢুকলে প্রথমেই কি পড়ে, তারপরে কি, ক'টা বাঘ, সিংহ ক'টা, হাতীগুলো কত বড়, তাদের পায়ের বাঁধা শিকলগুলি কতখানি মোটা, কুমীরের দল কোন্ ঘরে থাকে,—এ সমস্তই সে অনায়াসে বলে' যেতে পারে! ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ইতিহাসও তার জানা আছে, এবং যাদুঘরের রহস্যও আর তার কাছে অপ্রকাশ নেই···কিন্তু সব চাইতে তার

অগ্রগতি

চিড়িয়াখানার ওপরই রোখটা কিছু বেশী, এবং সেখানকার বাঘের গল্পই সব চাইতে তার প্রিয়। সুতরাং, সেই একই প্রশ্ন বার বার সে জিজ্ঞাসা করে, "ওগো বাঘের কাছে যেতে ভয় করে না?"

"ভয় কি?"

"বাপ্‌রে! যদি খেয়ে ফেলে!"

"খায় না!"

একই প্রশ্নের এই একই উত্তর সলিল অনেকদিন ধরে' দিয়ে আসছে। আজও তাই বাঘ-প্রসঙ্গে অমিতার বাকী প্রশ্নগুলো যেন তার কানে ঢুকলো না।

পর-পর কয়েকটী প্রশ্নের জবাব না পেয়ে বধূ চুপ করে' থাকে...।

সলিল তার আরও কাছে সরে' আসে, বলে, "কিগো, কথা নেই যে মুখে? ...রাগ হ'য়েচে বুঝি?...হ্যাগা, কতটুকু রাগ হ'য়েচে?···দুমিনিটের?···পাঁচ মিনিটের?···না?···ছ'মিনিটেরই হবে বোধ হয়, এখনও যখন কথা নেই! একটু দীর্ঘ সময়, কষ্টও আমার হবে একটু···তা'হোক্, উপায় তো আর নেই!···

অমিতা অবশেষে হেসে ফেলে, বলে, "হুঁ, কষ্ট হবে না হাতী! আমি কথা না বল্লে তো তুমি সুখীই হও!··"

সলিল প্রতিবাদ ক'রে বলে, "মিথ্যে কথা,···কক্ষনো না"

ওদের ভাব হ'য়ে গেছে।···

হঠাৎ অমিতার চাপা খুট্‌খুট হাসি শুনে সলিল বলে, "কিগো?"

"কিছু না!"

"না মানে? কথা নেই বার্ত্তা নেই, হঠাৎ খুট্‌খুট্ করে' হাসি, আর জিজ্ঞেস করলে, কিচ্ছু না?"

অমিতা চুপ ক'রে থাকে। সলিল ডাকে, "এই—"

"কি?"

"বলবে না?"

"আমার ভারী লজ্জা করে!"

"আমার কাছেও লজ্জা?"

বধূ কথা বলে না! সলিল বলে, "বলবে না তো?"

অগত্যা কথা কইতে হয়। অমিতা বলে, "বলো, রাগ করবে না!"

"না।"

"হাসবেও না?"

"না!"

"মনে-মনেও না কিন্তু,—"

"মনে-মনেও না···আচ্ছা তাই···"

তবু তার মুখে কথা ফোটে না! সলিল বলে, "কইগো!"

স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে অমিতা আব্দার করে' বলে, "কিন্তু আমার ভারী লজ্জা করে যে—,"

"অন্ধকার ঘর, কেউ কোথাও নেই, তবু লজ্জা?"

"হ্যাঁগা, রাগ করবে না ঠিক?"

"না, সত্যি না।"

বধূ থেমে থেমে বলে "বলছিলুম কি,···ওগো, জানালাটা বন্ধ করে' দিই?—জ্যোছ্‌না এসেচে ঘরে..."

"আসুক জ্যোছ্‌না, ভালই তো' বেশ!"

কিন্তু অমিতা বন্ধ ক'রে দেয়। নিবিড় অন্ধকারেও দুই হাতে মুখ ঢেকে সে বলে, "বলছিলুম কি, আলীপুর যাবো তো পরশু···" সহসা সে থেমে যায়!

সলিল বলে, "কি?"

"সেদিন,—সেদিন একটু মোটরে চড়ব,—ট্যাক্সিতে!···"

দরিদ্র কেরাণীর মুখ অন্ধকার হ'য়ে ওঠে।···দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে জোর করে' হেসে বলে, "এরই জন্য এত?"

কিন্তু অমিতার লজ্জার আর পরিসীমা নেই...

সলিল ডাকে, "অমূ।"

অমূ নিরুত্তর।···

"আজ যা' বিপদে পড়েছিলুম, অমূ···।"

স্বামীর বিপদের কথায় বধূর লজ্জা ভেঙে যায়···ব্যাকুল কণ্ঠে বলে, "কিগো?"

"ট্রাম" বলে' সলিল এক বাজে গল্প জুড়ে দেয়।

খানিক বাদেই সহজ কথাবার্ত্তা।

হঠাৎ অমিতা অত্যন্ত চিন্তিত হ'য়ে বলে, "ওগো!"

"কি?"

"আমার যে ভালো একটা পিনটিন নেই কিছু—···"

"কি হবে তা' দিয়ে?"

"বেণুদি'র কাছে শুনেচি, মোটরে চড়লে নাকি মাথার কাপড় হাওয়ায় উড়ে যায়!"

"উড়লই বা!"

"বারে মজা, উড়লই বা!···রাস্তার লোক চেয়ে থাকুক মুখের দিকে···"

"থাক্‌লই বা!···তোমার গালে ঠোঁটে তো আর দাগ লেগে নেই যে—"

অমিতা সহসা কুপিত হ'য়ে বলে, "যাঃ, অস—"অকস্মাৎ সে থেমে যায়!

সলিল বলে, "কি, অসভ্য?"

অমিতা ব্যাকুল হ'য়ে বলে, "না না, দিব্যি ক'রে বলচি, অসভ্য না! বলছিলুম···বলছিলুম কি···অসম্ভব···"

"কি অসম্ভব?"

অমিতা ভুরু কুঁচিয়ে, ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, "যাঃও, জানিনে আমি···"

তারপর ওরা ঘুমিয়ে পড়ে···

পরদিন কাক না ডাকতেই দু'জনকে শয্যাত্যাগ করতে হয়। অমিতা উনুনে আগুন দেয়, সলিল নানাভাবে তাকে সাহায্য করে; তরকারীটা কুটে দেওয়া, দু'এক বালতী জল আনা, এমনি কত কি···। অবশেষে তাড়াতাড়ি মাথায় একটু জল দিয়ে সে খেতে বসে।···আটটা চল্লিশে তার গাড়ী···হাওড়া পৌঁছুতে স'নটা···তারপর ওখান থেকে হেঁটে আপিস!

সলিল বলে, "তরকারীটা যা' হয়েচে, সত্যি,···"

অমিতা শাসন ক'রে বলে, "আবার কথা! এতদিন বলি ওগো, কথা না ক'য়ে ততক্ষণ দু'টো খাও দিকিন, পেটটা ভরুক!···তা' নয়, ডালটা ভাল, তরকারীটা চমৎকার, ব্যস, যেটুক সময় থাকে খাবার, গল্পেই তার শেষ।···আচ্ছা বাপু, কাল থেকে নুন আর হলুদে পুড়িয়ে রেখে দেব, চুপটী ক'রে খেও তখন। দেখব তখন প্রশংসার চোট···"

সলিল খুশী মনে তার বধূর শাসন মেনে নেয়।

তাড়াতাড়ি সবই হ'য়ে যায়।···পোষাকের বাহুল্য তো নেই কিছু! দশজন কেরাণীর যা' থেকে থাকে,···একটা পুরোনো ছাতা, মলিন একটা সার্ট, এবং ধূলোয় ধূসরিত একজোড়া সস্তা স্যাণ্ডেল···

অমিতা পান হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে···সলিল ছুটে যাবার সময় পানটা তার মুখে দিয়ে দেয়।···সলিল তার গাল টিপে চলে' যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে থিয়েটারী ষ্টাইলে বলে, "তবে যাইগো, তবে যাই···"

বধূ শূন্য মনে তার যাবার পথে চেয়ে থাকে···

অবশেষে তার গৃহস্থালীর কাজ···দু'জনের সংসার, কিই বা এমন কাজ! সহজেই হ'য়ে যায়!···সারাটা দিন সে এমনি একা একা কাটায়।···বাড়ীতে এমন একটা মানুষ নেই যে দু'দণ্ড আলাপ করে।···দু'একদিন হয়ত দু'একটী সখী পাড়া থেকে বেড়াতে আসে,···কিংবা সে যায়।···কিন্তু ভাল তার লাগে না কিছুই।···

অতঃপর সন্ধ্যা আসে, পল্লীর সন্ধ্যা!···তার মৌন শান্তিতে সমস্ত বুক ভরে' যায়।

সহসা সে সচকিত হ'য়ে ওঠে···কাল যে তার আলীপুর যাবার কথা গো···কাজ-কর্ম্ম তো সব আজই করে' রাখা দরকার। হয়ত সময়ও পাবে না কাল...দু'টো রেঁধে খেয়ে যাবারও সময় হবে না তার।···তরকারী-টরকারী দু'-একটা যা' হোক আজই সে রেঁধে রাখ্‌বে। কাল সক্কালে উঠে কোনমতে ভাতটা নামিয়ে নেবে!...আলীপুর তো আর এখানে নয়···

সুতরাং সে কাজে লেগে যায়।···সলিলের আজ দেরী হ'চ্চে আসতে, তা হোক···এলেই তো তার কাজ কর্ম্মে ইতি।···যে দুষ্টু, মাগো...খালি···

তার ঠোঁটের কোলে হাসি ফুটে ওঠে। সে যে তার দুষ্টুমি ভালো না বাসে, এমন নয়! তার ভালই লাগে, বড্ড ভালো।···

তার বাড়ীর কথা মনে পড়ে। একটী সহোদর ছাড়া, কেউই তো নেই তার, যে-কাকা দয়া করে' বিয়ে দিয়ে তাকে বিদায় করলেন,···থাক্‌, অমিতা আর অতীতের কথা ভাববে না···ভাইটী তার ভাল থাক্‌, ভাল হোক্‌।···ভগবানকে ধন্যবাদ যে এইখানেই তার মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁই হয়েছে!

কত কথাই তার মনে আসে।···পাশের বাড়ীর দু' একটী ছেলেমেয়ের কান্নাকাটী শোনা যাচ্ছে। সে ভাবে, তারও যদি...। অমিতার দু'কান লজ্জায় রাঙা হ'য়ে ওঠে। সে এ-দিক ও-দিক চেয়ে দেখে, কেউ আছে কি না!

তরকারীটা রান্না হয়ে গেছে। এইবার সে সব ঢাকা দিয়ে ঠাঁই করে' রাখ্‌বে।...সলিল আসবে এখুনি হয়ত...

সত্যিই সলিল এলো, কিন্তু...

আজ তার চোখে-মুখে হাসি নেই কেন? কই তার সহজ সরল চটুলতা? অমিতার মন অনিশ্চিত শঙ্কায় ভরে' যায়, বলে, "কিগো?"

"কিছু না, অমু, আচ্ছা, বলব'খন! এস, আগে খেয়ে নিই!"

আজ চোখ টেপার আনন্দ নেই। খাবার পর্ব্বও অতি সহজে সমাধা হয়ে গেল।

সলিল তো সবই জানে...। অমিতার মনও ভাল লাগে না···।

ওরা দু'জনেই বিছানায় শুয়েছে।...আলোটা আজ আর জ্বালা নেই! জানালা দিয়েও নেই কালকের মত ঝির্‌ঝিরে হাওয়া!

সলিলের বুক ঠেলে' কান্না আসে, বলে, "অমু..."

অমিতা অন্ধকারে তা'র মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, উত্তর করে, "কি গো!"

"বড়বাবুর বিয়ে হয়নি কিনা, অমু, তাই সে আমায় ছুটি দিলে না!" অমিতা অবাক কণ্ঠে বলে, "কি বলছ তুমি!"

"আপিস!···বড়বাবুর হুকুম, অমু, কাল রোববারও আমায় আপিসে যেতে হবে।"

বধূর মুখ ভারী হয়ে ওঠে, বলে, "আলীপুর যাওয়া হবে না তবে?"

সলিল শ্রান্ত কণ্ঠে বলে, "কই আর হ'ল অমিত!···এত ক'রে

বল্লুম, 'বড়বাবু, কালকের দিনটে আমায় ছুটী দিন।'···চশমখোর দিলে না কিছুতেই।" সলিলের দু'গণ্ড বেয়ে ধারা নামে!

অমিতা সান্ত্বনা দিয়ে বলে, "ছিঃ, দুঃখ ক'রো না তুমি!... কাল না হয় আর একদিন যাবো!..."

সলিল বলে, "ভরসা কি অমু!···আজ তিন মাস ধরে' যাই-যাই ক'রেও তো যাওয়া হ'ল না!"

অমিতা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে, "হবে একদিন!"

"হয়ত হবে" বলে' সলিলও বধূর মত নিঃশ্বাস ছাড়ে। তারপরে কপোলে হাত বুলিয়ে বলে, "আচ্ছা অমু, ঘুমোও···"

দু'টী কচি কোমল বাহু দিয়ে স্বামীর গলদেশ বেষ্টন করে' বালিকা পরম নিশ্চিন্তে ও একান্ত বিশ্বাসে তার বুকে মুখ গুঁজে ঘুমোয়···

কিন্তু সলিলের নেই ঘুম···তার দু'চোখ বেয়ে ধারাই পড়ছে। চোখের জল তা'র মুছ্‌তেও সাহস হয় না; কি জানি, সামান্য কারণেও যদি তার এই অবিশ্রান্ত ক্রন্দনের ইতিহাস ধরা পড়ে...

হায়রে, রবিবারেও আপিস, এই মিথ্যা সে অনায়াসে বলেচে ...এবং বধূও নিঃসন্দেহে সে-কথা বিশ্বাস করে' নিয়েচে।...কিন্তু হে ভগবান, তুমি তো জানো, দরিদ্র কেরাণীর ইতিহাস!···ক'টি টাকা তার উপার্জ্জন,ক'টি টাকা তার খরচ!···মাসের শেষে মোটে তিরিশটি টাকা, ঘর ভাড়া, ধোপার দাম, মুদীর দোকান, রেলের টিকিট, কয়লা, ঘুঁটে...ক'টি পয়সা তার উদ্বৃত্ত হয়...তবু কোনমতে কষ্টেসৃষ্টে চলে' যায় দু'জনের সংসার। এর ওপর একটী অতিরিক্ত খরচ হ'লে, সে-ধাক্কা যে কতবড় ধাক্কা, সলিল তার অভিজ্ঞতা দিয়ে মর্ম্মে মর্ম্মে তা' বুঝে নিয়েচে!

সুতরাং এই যে ক'মাস ধরে' সে আলীপুর যাবার প্রস্তাব পরিহার করে' চলেছে,...দুঃখ কি তার হয়নি, বুকে কি তার বাজেনি?...কি অদম্য ইচ্ছাকে সে চোখ রাঙিয়ে শাসন করে' এসেচে!...হয়ত তার বুক ভেঙে গেছে, তবু,...তবু···

কাল!—কালও তো সারাটী দিন বিনা কাজে কলকাতায় ঘুরে বেড়াবে—আপিস তো নেই সত্যি—কিন্তু অমিতাকে সে বলেচে—। এড়াবার যে আর পথ ছিল না!

একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস সে চেপে যায়!···কত লোক মোটরে, ট্যাক্সিতে চড়ে' বেড়াবে—সে তাদের-ই পানে উদাসভাবে চেয়ে থাকবে।—ভগবানের এমনি অভিশাপ, রবিবারটীও তার এম্‌নি একা-একা নিরর্থক হ'য়ে যাবে! আর আজ, শনিবার—সুখবার! —অদৃষ্টের কি নির্ম্মম পরিহাস!

তার চোখের পাতা আরও ভারী হ'য়ে ওঠে! অমিতা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েচে—হয়ত তার অভিমান হ'য়েছে। সলিলের দ্বিগুণ বেগে কান্না আসে!

কিন্তু যদি সে যেতে পারতো!···কোনমতে ক'টা টাকা সংগ্রহ করে' যদি বাস্তবিকই সে যেতে পারতো!—তাদের আনন্দোজ্জ্বল মুখের দিকে কত লোক হয়ত চেয়ে থাকতো বিস্ময়ে। তারপর সে যেতো ট্যাক্সি হাঁকিয়ে! রাজেন্দ্রাণীর মতো তার বধূ! মোটরে তাকে মানাতো ভালো!—এবং যে লজ্জা তার—ঘোমটা যেতো উড়ে—আর চোখাচোখী হ'লেই হাসতো তা'রা!

ফেরবার পথে হগ্‌মার্কেটটাও ঘুরে আসা যেতো। সেদিন সখ করে' সলিল ভাল একটী জিনিষ তাকে উপহার দিতো। তার সুন্দর সরল মুখখানিতে কত আনন্দই না খেলে যেতো—সেই নত নম্র দু'টী চোখ···

কিন্তু কাল···সে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াবে একা···

সে চম্‌কে ওঠে! অমিতার সুপ্ত দু'টী চোখে সন্তর্পণে সস্নেহ চুম্বন দিয়ে, চোখ মুছে মনে মনে বলে, "অপরাধ নিওনা প্রভু! যে রত্ন আমায় দান করেচ, তাই আমার চিরকাল উজ্জ্বল হ'য়ে থাক্‌! আমি ধন চাইনে, অর্থ চাইনে, আমায় যা' তুমি দিয়েচ দেবতা, তাই আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে পেতে দাও—"

তার মন সুস্থ হ'য়ে ওঠে। সে জানে, কাল আবার তাদের সহজ সুন্দর জীবনের অনাবিল স্রোত বয়ে' যাবে—আবার তাদের হাসি এবং আনন্দ!—সে পুনরায় অমিতার দুই ঘুমন্ত চোখে সস্নেহ চুম্বন দেয়···

অমিতা জেগে ওঠে, বলে, "দুষ্টু!"

"কি?"

"চুরি ক'রে,"—তার বাক্য শেষ হয় না!

সলিল বলে, "কিগো অমিত!"

অমিত বলে, "ওগো কচিখোকাবাবু, কিছু তো বোঝ না তুমি, সুতরাং থাক্‌—"

"ইস্‌, থিয়েটার দেখলে কোথায়, অমু?"

অমিতা গম্ভীর হ'য়ে বলে, "দেখেছি!"

"দেখাবো তোমায় একদিন," সলিল বলে, "কিন্তু ইচ্ছে যায় না, কচি খোকার বধূ, সেই ছুটীর দিনটী সকলের মধ্যে তোমায় নিয়ে বেড়াই। একটু ঠাট্টা তামাসা কিছু করা যাবে না!—শুধু মুখ বুজে বসে' থাকা···"

অমিতা বলে, "আগে কিন্তু আলীপুর!"

সলিল দীর্ঘনিঃশ্বাস রোধ ক'রে বলে,"হ্যাঁ আলীপুর!" তারপর সহসা হেসে বলে, "কিন্তু তোমার ঘোম্‌টা-খোলা মুখের দিকে যদি লোকে চেয়ে থাকে, আমি কিন্তু জানিনে অমু—"

অমিতা লজ্জা পায়, স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে শুধু মৃদুস্বরে বলে, "অসভ্য!"

অবশেষে ওরা ঘুমিয়ে পড়ে!

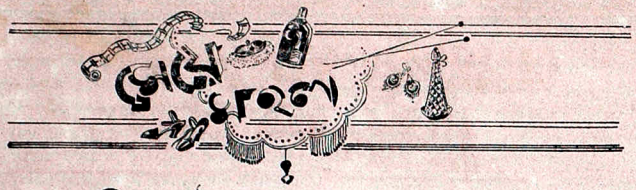

আমরা কি চাই ?

তপতী চৌধুরী

শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেলো। লোকের মুখে চিঠিতে বই-এ পত্রিকায় সর্ব্বত্র ঐ এক কথা, 'মেয়েরা কি চায় ?' যেন মেয়েরা আর কোনও এক রকমের আর এক জগতের জীব, হঠাৎ এসে পড়েছে পৃথিবীতে, মানুষের সমাজে। যেন তা'রা কোনওদিন চোখ ফুটিয়ে দেখেনি কিছু, কানের তুলো খুলে' শোনেনি কিছু, মুখ হাঁ করে' বলেনি কিছু !

পুরুষের পক্ষে, অর্থাৎ যে-সব পুরুষ নীতি ন্যায় ও সমাজের দোহাই দিয়ে নিজেদের মাতব্বরীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিল এতকাল,—তাদের পক্ষে এই হিপোক্রিসীর দরকার ছিল। তা'রা যেন কিছু জানেন না ! 'মেয়েরা কি চায় ?' এরা এত-দিন অবধি ঘরে বউকে ধরে' কিলোতো আর বাইরে দাড়ীতে হাত বুলিয়ে নীতির বুলি আওড়াত। মেয়েরাও যে তা'দেরই মত মানুষ, তা' যেন এরা এতদিন কল্পনাই করতে পারে নি। শাস্ত্র নারীকে বর্জ্জন করেছে, ধর্ম্ম নারীর নাম শুনলে আঁৎকে ওঠে, আইন মেয়েদের ফাঁকী দিয়েছে। এই ফাঁকীর ও ঠকানোর ওপর যা'রা এত দিন রাজত্ব চালিয়ে এসেছে, নারী-প্রগতির রূপ দেখে তা'দের চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠেছে।

এক এক ক'রে ধরা যাক্। মেয়েদের শরীর নাকি এতই সুন্দর যে তা' আধ ডজন আরু দিয়ে ঢেকে না রাখলে উবে' যাবে ! অথবা এতই কলঙ্কপূর্ণ যে তা'র ঈষৎ মাত্র চোখে পড়লেই, বাস, একেবারে সোজা নরক ! সুতরাং পর্দা দিয়ে ঢাকো তা'কে ; একটি আবরণ যদি কম পড়ে তা'তে, তা' হলে সৃষ্টি একেবারে রসাতলে যাবে।

তারপর, আমরা যেন সব সময়েই ছেলেদের 'ভোবাবার' জন্য তৈরী হয়ে আছি ! কোথায় কোন ছেলে বিয়ে করছে না, খোঁজ খোঁজ, কোনও মেয়ের সঙ্গে নিশ্চয়ই প্রেমে পড়েছে, তা' নইলে বিয়ে করে না ? কে কোথায় বিষ খেলো—নিশ্চয়ই নারী-প্রেমঘটিত। এমনি ধারা কতো কী !

ছেলেরা রাত বারোটা অবধি বাইরে থাকুক, দোষ নেই। কিন্তু মেয়েরা যদি কেউ পনেরো মিনিট দেরী করে' ঘরে ফিরলো তো সর্ব্বনাশ !

এ রকম যে কত আছে তা'র আর সীমা নেই।

আমরা যা'রা একালের মেয়ে, তা'রা বিশ্বাস করি এবং বলতে সাহস রাখি যে, শালীনতা নীতি ন্যায় আইন এবং কাণ্ডজ্ঞান ও মনুষ্যত্ব—কেবল মাত্র পুরুষের জন্যই নয়। সোজা কথায় বলি : বেশে ভূষায় আচারে ব্যবহারে, অর্থাৎ এক কথায় জীবনের সকল দিকেই পুরুষের যে স্বাধীনতা আছে, তা' মেয়েদের জন্যও আছে। পুরুষ যদি ব্যাভিচার করে আর সমাজ যদি তা' নীরবে সহ্য করে তা' হ'লে মেয়েরা স্টেটের খরচায় জন্ম-নিরোধের দাবী কেন করবে না ?

এ-যুগের মেয়েরা জানে মনুষ্যত্বের দাবীকে কি করে' সার্থক করতে হয়। যা'রা মানুষের সমাজকে পূর্ণতর করে' তুলতে চায়, সেই এ যুগের পুরুষদের এ কথা ভাল করে' ভেবে বোঝবার সময় এসেছে।

কোনও মেয়ে যদি শর্ট্ ও শার্ট্ পরে' মাঠে খেলতে যায়, কিংবা সুইমিং কষ্ট্যুম পরে' নদীতে বা পুকুরে সাঁতার কাটে, তা' হলে সে যে এমন-কিছু অসাধারণ কাজ করছে না এটা সহজে মেনে নেবার মত সুবুদ্ধি যেন পুরুষের হয়।

মেয়েরা যে কবিতাও নয় কিংবা পশুও নয়, তা'রা যে মানুষই, এই কথাটাই আমরা হিপোক্রিট্ ন্যাকা চৈতন্যদের, কান মলেই হোক্, বা চড় মেরেই হোক্, কিংবা সোজা কথাতেই হোক্, মেনে নেওয়াতে চাই।

হকি—

ভারতের হকি-জগতে সম্প্রতি ধ্যানচাঁদ প্রায় লঙ্কাকাণ্ডের যোগাড় করে' তুলেছেন। তিনি বলেছেন, পেশাদারীর ভূত নাকি হকি-মাঠের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁর কথায় ঘাবড়ে গিয়ে হকি এসোসিয়েসন তাঁর কাছে জানতে চেয়েছে, এর কি প্রতিকার করা যায়। উত্তরে তিনি কতকগুলি মতলব বাৎলে দিয়েছেন। তার মধ্যে প্রধান কথা হচ্ছে যে, এসো-সিয়েসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও অসংশ্লিষ্ট ক্লাব ও তাদের খেলোয়াড় সম্পর্কে কড়া আইন করা এবং তাদের প্রতিযোগিতায় যোগদান করার ওপর কড়া নজর রাখা। এ্যামেচার পেশাদার সংক্রান্ত গোলমাল ফুটবলেও উঠেছে। খেলোয়াড় নিয়ে ক্লাবদের মধ্যে কাড়াকাড়ির হাঙ্গামাটা সম্প্রতি ভারতের স্পোর্ট-জগতের একটা প্রধান অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। দেখা যায় একই খেলোয়াড় বিভিন্ন ক্লাব ও বিভিন্ন প্রদেশের হ'য়ে খেলে বেড়াচ্ছেন। পেশাদারী ব্যবস্থা ভাল কি মন্দ সে প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও এই যাযাবর-বৃত্তি যে ক্লাবগুলির উন্নতির অন্তরায় এটা সত্যি কথা। এ ব্যবস্থাকে বন্ধ করার দিকে এসোসিয়েসনের লক্ষ্য দেওয়া উচিত।

ধ্যানচাঁদ অবশ্য এতেও ক্ষান্ত হননি। প্যালেষ্টাইনের Western Asiatic Gamesএ একটি শক্তিশালী ভারতীয় হকিদল পাঠানো সম্পর্কে প্রবলভাবে বিরুদ্ধ মত জানিয়েছেন। তাঁর মতে প্যালেষ্টাইনে শক্তিশালী বিপক্ষদল একটিও থাকবে না। কাজেই অর্থব্যয় করে' যদি দল পাঠাতেই হয় তাহ'লে তাঁর মতে নতুন খেলোয়াড়দের সুযোগ দেবার এই শ্রেষ্ঠ অবসর।

আবার মানবদর দলের নিউজিল্যাণ্ড যাওয়া সম্পর্কে তিনি বলেছেন একটি মাঝারি শক্তিসম্পন্ন ক্লাবকে বাইরে খেলতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া এসোসিয়েসনের পক্ষে আশ্চর্য্যজনক ঘটনা। এতে ভারতের আন্তর্জাতিক খ্যাতি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ সম্পর্কেও আমাদের মনে হয়, তাঁর কথা ঠিক। নিউজিল্যাণ্ড হকিতে শক্তিহীন নয়। কিছুদিন আগে যে ভারতীয় দলটি সেখানে খেলতে গেছল তারা সে-কথা টের পেয়ে এসেছে। টেস্ট্ খেলায় তা'দের দু'বার হারাতে ভারতীয় দলকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। অথচ সে ভারতীয় দলে ধ্যানচাঁদ, রূপসিং, পি, দাস, মুখার্জ্জি প্রভৃতি ভাল খেলোয়াড়রা ছিলেন। সেখানে মানবদর দল গিয়ে কি করবে ! মানবদর দলে অবশ্য তিনজন নিগিল-ভারত খেলোয়াড় আছেন। যথা, মহম্মদ হোসেন, পি, ফার্ণাণ্ডেস ও সাহাবুদ্দিন। কিন্তু তবু নিউজিল্যাণ্ডে জিত্‌তে হ'লেও অপরাজিত থেকে ভারতের গৌরব অক্ষুন্ন রাখতে হ'লে ধ্যানচাঁদের প্রতিভার সাহায্য দরকার।

আপনারা শুনলে সুখী হবেন, ধ্যানচাঁদ শিগ্‌গিরই বাঙলায় স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করছেন এবং খুবসম্ভব বাঙলা দলের হ'য়ে খেলবেন।

বেটন কাপে বাইরের যে দলগুলি এসেছিল তাদের সম্পর্কে গোড়ায় যা' বলেছিলাম তাই শেষ পর্য্যন্ত প্রমাণ হয়েছে। অনেক বড় বড় দলই এসেছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বাঙলার প্রাধান্যই বজায় রইল। বম্বের লুসিটেনিয়ান দল অবশ্য অপূর্ব্ব ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়ে আমাদের প্রশংসার ওপর দাবী জানিয়েছে।

ক্রিকেট্—

ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়া দিল্লী থেকে বম্বেতে উঠে যাচ্ছে। ১লা মে রবিবার ক্লাবের একটি অধিবেশন হবে। সেখানে নতুন সভাপতি নির্ব্বাচন হবে। খুব সম্ভব স্যার নওরোজি সাকলাৎ-ওয়ালা এই পদের অধিকারী হবেন। এর পর আলোচনা হবে আগামী শীতে মিষ্টার ট্যারাণ্ট্ প্রস্তাবিত অষ্ট্রেলিয়ান্ হকি দলকে ভারতে খেলবার জন্যে নিমন্ত্রণ করা হবে কিনা। বোর্ড অব কণ্ট্রোল ট্যারাণ্টের প্রস্তাবে রাজী হয়নি তবে ক্রিকেট ক্লাব যদি রাজী হয় তাহ'লে এ বিষয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করতে তা'দের অনুমতি দিয়েছে।

—স্পোর্টস্‌ম্যান

আমোদের আবহাওয়ায়

['অগ্রগতি'র 'আমোদের আবহাওয়া'য় একেবারে চতুর্থশ্রেণীর কোনো নাটক বা ছায়াচিত্রের সমালোচনা প্রকাশিত হয় না।]

পর্দ্দার খবর

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

গত সপ্তাহে একটি কৃত্রিম ধানক্ষেতের সেটে 'দেশের মাটী' (হিন্দী—ধরিত্রীমাতা) চিত্রের অন্তর্গত একটি দৃশ্যের চিত্র-গ্রহণ করা হয়েছে। এই দৃশ্যে অভিনয় কোরেছেন নবাব (হিন্দী সংস্করণ), অমর মল্লিক ও উমা—তিনজনই খুব সুন্দর অভিনয় কোরেছেন বোলে সংবাদ পেলাম।

শ্রীযুত প্রফুল্ল রায়ের পরিচালনায় 'অভিজ্ঞান' (হিন্দী—অভাগিন)-এর কাজ সমাপ্তির মুখে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। একটি

'অভিজ্ঞান' চিত্রের একটি দৃশ্যে মলিনা, শৈলেন চৌধুরী ও শৈলেন পাল।

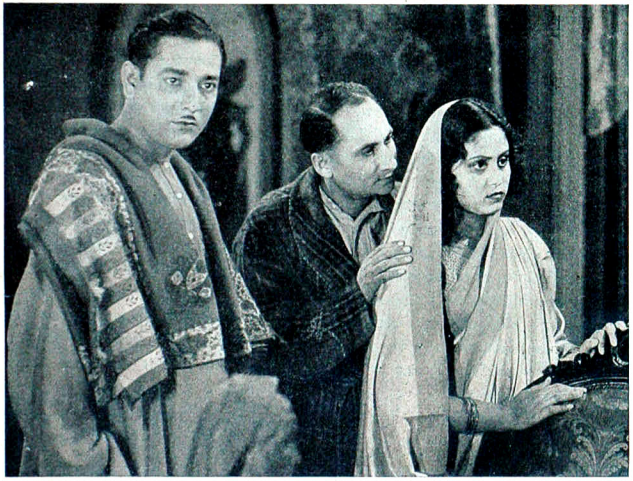

প্রকাণ্ড সেটে বেনারসের একটি ব্যস্ত ও জনবহুল রাস্তার চিত্র-গ্রহণ-সম্পর্কে গত সপ্তাহে পরিচালক ও তাঁর যোগ্যসহকারী ফণী মজুমদার রীতিমতো ব্যস্ত ছিলেন। শুনলুম, স্বাভাবিকতার দিক দিয়ে এই দৃশ্যটি অত্যন্ত নিখুঁত ও নির্ভুল হয়েছে। ভানু ব্যানার্জি (হিন্দী সংস্করণে হাসমাত) এই দৃশ্যে একটি তরুণ শিল্পীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

ও, কে, এ-র 'রূপোর ঝুমকো' চিত্রের একটি দৃশ্যে ধীরাজ ও পারুল।

অগ্রগতি

ফণী মজুমদার পরিচালিত 'ষ্ট্রিট সিঙ্গার'-এর নায়ক সায়গাল স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় কয়েকদিনের জন্য আসাম অঞ্চলে অবস্থান কোরছেন। তিনি ফিরে এলেই আবার পুরোদমে কাজ চলতে থাকবে।

'বড়দিদি' চিত্রের নায়িকা মলিনা 'অভিজ্ঞান' চিত্রের অভিনয়ে আটকে থাকায় শ্রীযুত অমর মল্লিকের ছবির মহলা সাময়িকভাবে স্থগিত আছে। স্বয়ং পরিচালকও 'দেশের মাটী' চিত্রের অভিনয়ের জন্য আপাতত ব্যস্ত আছেন। সম্ভবত, আগামী সপ্তাহ থেকেই তিনি 'বড়দিদি' চিত্রের কাজে হাত দেবেন।

আজ থেকে চিত্রায় 'বিদ্যাপতি'র পঞ্চম সপ্তাহ সুরু হ'ল।

দেবদত্ত ফিল্মস

শ্রীযুত নরেশ মিত্র পরিচালিত এঁদের 'গোরা'র কাজ দ্রুত সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সম্প্রতি, শেষ-দৃশ্যের বিরাট সেট্‌টিতে কাজ চলছে।

সরমা পিকচার্স

আমরা অবগত হ'লুম, নব প্রতিষ্ঠিত সরমা পিকচার্সের 'মায়া-মৃগ' চিত্রে এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থাকবে যা' কিনা ইতিপূর্বে কোনো বাঙলা ছবিতে দেখানো সম্ভব হয়নি। যেমন ধরুন: এই ছবির নায়িকা যূথী ও তার মা লীলার চেহারায় ছিল অপরূপ সাদৃশ্য—আর তাই নিখুঁত কোরে তুলতে এঁরা শ্রীমতী কমলা দে-কে এই দু'টী ভূমিকাই অর্পণ কোরেছেন। যে-সমস্ত দৃশ্যে একযোগে মা ও মেয়ে উপস্থিত আছেন সেগুলি হলিউডে প্রচলিত আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গৃহীত হয়েছে।... এঁদের অন্যতম প্রধান শিল্পী ললিত মিত্রের মৃত্যুর ফলে এঁরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছেন।...উদীয়মান কবি সুশীলকুমার ঘোষ 'মায়া-মৃগ' চিত্রের প্রচার-সচিব নিযুক্ত হয়েছেন।

'প্রভাত সিনেমা'র শুভ-উদ্বোধন

গত বৃহস্পতিবার থেকে কর্পোরেশন ষ্ট্রীটের 'ম্যাডান থিয়েটার্স' চিত্রগৃহটি 'প্রভাত সিনেমা'য় পর্য্যবসিত হ'ল। উদ্বোধন রজনী থেকে এখানে সাগর ফিল্মসের 'জাগীরদার' ছবিখানি দেখানো হচ্ছে। অবগত হ'লুম, এখন থেকে এখানে শুধু শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ছবিগুলিই দেখানো হবে।

—প্রবীর চৌধুরী

এম্, এ, এগ্‌জামিন দিয়ে
বিমল হঠাৎ তীর্থ-পর্য্যটনে মন দিল—
এবং তা'র এক অদ্ভুত খেয়াল ছিল
ভিখারিণীদের মুখ দেখবার চেষ্টা করা!

কিন্তু
মায়া -   - মৃগ
কি
বিমলকে ধরা দিয়েছিল?
"যমুনা পুলিনে ভিখারিণী"র চিত্ররূপ
নির্ম্মাতা—
সরমা পিকচার্স

—'অগ্রগতি' আশু চট্টোপাধ্যায় এডিট্ করেছেন— আর ৭৬, কৈলাস বোস ষ্ট্রীটের 'অগ্রগতি প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং ওয়ার্কস্' থেকে তিনিই ছাপিয়ে বের করেছেন।

শনিবার, ৩০এ এপ্রিল হইতে
পঞ্চম সপ্তাহ
নিউ থিয়েটার্সের নবতম মনোহর চিত্র
বিদ্যাপতি

রাজা বলেন: "প্রতিমা পেয়েছি, কিন্তু প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি—
কবি, তোমার কবিতা হবে আমার মন্ত্র, তুমি হবে আমার পুরোহিত,"
কিন্তু—রাজার মনের গভীর প্রেম রাণীর অন্তর স্পর্শ করিতে পারিল কি?

বিদ্যাপতি ❋ আপনার মনে গভীর রেখাপাত করিবে
ইহার অভিনয়, সঙ্গীত বাদ্য সব কিছুই মনোহর,—অপূর্ব্ব

দুইদিন পূর্ব্বে সিট রিজার্ভ করিবেন
চিত্রা :
ফোন বি, বি ১১৩৩

নিউথিয়েটার্সের আগামী নিবেদন
অভিজ্ঞান
পরিচালক : প্রফুল্ল রায় • চিত্র-নাট্যকার : ফণী মজুমদার
প্রধান ভূমিকায়—মলিনা, মেনকা, জীবন গঙ্গোঃ, শৈলেন চৌধুরী, শৈলেন পাল, মনোরঞ্জন ও ভানু বন্দ্যোঃ
রূপবাণীতে মুক্তি-প্রতীক্ষায়